চৌধুরী কাস্‌ল্

সতীকান্ত গুহ

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯

উপন্যাসটি প্রথমে 'পদক্ষেপ' পত্রিকার, শারদ সংকলনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিছুটা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা

আলোর পাহাড়

লালকমল নীলকমল (দুই খণ্ড) তৃতীয় মুদ্রণ

গল্প

ছয় ঋতু

খেয়ার মাঝি লক্ষ্মীনাথ (তৃতীয় মুদ্রণ)

অপরূপ কথা (চতুর্থ মুদ্রণ)

দুরন্ত কাহিনী (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

উপন্যাস

বেনামী নিশান

ইতিহাসে নেই

মহাপ্রস্থান (যন্ত্রস্থ)

নাটক

নূতন দিনের রূপকথা

মোটা মাইনের চাকরির লোভে শুভঙ্কর ঘোষ কলকাতা ছেড়ে নিউ দিল্লীতে এসে অথই জলে পড়ে গেল। কলকাতার চাকরিতে ইস্তফা দেবার আগে শুভঙ্কর মনে মনে একটা হিসেব ধরে দেখেছিল নিউ দিল্লীর চাকরিতে মাইনে থেকেই মাসে কম করে ছ'শ টাকা জমানো সম্ভব। মাঝারি ভালো একটা হোটেলে আরামে আয়েসে থেকে সব খরচ খরচার পরও এ টাকাটা হাতে থেকে যায়। মাসে ছ'শ টাকা বারো মাসে কত হয় এবং বছর বছর মাইনে বেড়ে কয়েক বছরে জমানো টাকা অঙ্কের কোন কোঠায় পৌঁছয় চিন্তা করে শুভঙ্কর মানসচক্ষে তিল কি করে তাল হয় সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছিল। দেখে অদৃষ্টের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার মনে বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল। সেদিন সে আর একটা সত্য আবিষ্কার করেছিল, প্রথম প্রেম যত মধুরই হোক তার কোথাও না কোথাও একটা কাঁটা ফুটে থাকে। অর্থপ্রেমের ক্ষেত্রে টাকা জমানোর আনন্দে কাঁটার মামুলী খোঁচাটুকু পর্যন্ত নেই।

শুভঙ্কর অবিবাহিত। ঘোর অ-সংসারী। তাই হোটেলের কথাই তার প্রথম মনে এসেছিল। তাছাড়া বিলাতী গল্পে উপন্যাসে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী পড়ে হোটেল-জীবনের উপর তার একটা বিশেষ পক্ষপাত জন্মেছিল। সুতরাং স্টেশন থেকে সোজা স্বল্পখ্যাত পরিচ্ছন্ন হোটেলটির অফিসে এসে আগন্তুকদের খাতায় নাম সই করতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। দ্বিধার দংশন সে প্রথম টের পেল পরের মাসের গোড়ায়।

থাকাখাওয়ার বিলের সঙ্গে টুকিটাকি নানা খরচের একটা বিল ছিল। শুভঙ্কর সভয়ে বিস্ময়ে দেখল, টুকিটাকি খরচের বিলটা একটা তাজা কেউটের মতো তার জমানো টাকার হিসেবের গায়ে মারাত্মক

ছোবল দিয়েছে। বিলটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করার পর শুভঙ্কর স্পষ্ট বুঝলো বিলে কোনো ভুল নেই। যত ভুল তার স্বকপোলকল্পিত হিসেবে। সেদিন সে প্রথম বুঝলো হোটেলেও সংসারের বাইরের একটা সংসার আছে এবং সেই সংসারে এমন একদল সর্বনাশা বেপরোয়া আমুদে মানুষ আছে যারা তার মতো অপটু মানুষের হিসেবের ভিত একাধিক আকস্মিক খরচের ধাক্কায় টলিয়ে দিতে পারে।

শুভঙ্কর বিশেষ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন অফিসে গেল। নটা থেকে একটা পর্যন্ত প্রতিমুহূর্ত সে কাজে ডুবে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু বারবার হিসেবের দুশ্চিন্তা তার মনের ঝুঁটি ধরে তাকে কাজের অতল থেকে টেনে তুললো। একটার ঘন্টা বাজতে সে অফিসারদের ক্যান্টিনে লাঞ্চের টেবিলে হাজির হল। "হ্যালো ঘোষ!" "হাউ ডু ইউ ডু?" ইত্যাদি সম্ভাষণ আপ্যায়ন ঈষৎ মাথা নেড়ে ঈষৎ হেসে আত্মসাৎ করে প্রতিদিনেরই মতো কেতাদুরস্তভাবে লাঞ্চ খাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই রণে ভঙ্গ দিয়ে কোনো একটা অজুহাতে সে তফাতে একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

শুভঙ্করের এক পর্যায়ের অফিসার আমেদ। অল্প ক'দিনেই তার খোলামেলা হাসিখুশি স্বভাব দিয়ে সে শুভঙ্করকে অত্যন্ত নিকটে টেনে এনেছিল। স্যুপ-য়ের চামচে হাতে নিজের অজ্ঞাতসারেই শুভঙ্কর যখন এয়ার-কনডিশনড্ ঘরের জানালার মোটা কাচের ভিতর দিয়ে দূরে ক্ষীণ যমুনার দিগন্তে তার বর্তমান সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরছে, আমেদ সন্তর্পণে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "মাই ডিয়ার ফেলো! হোয়াট্স্ দি বিগ আইডিয়া? আর ইউ ড্রিমইং?"

শুভঙ্কর আমেদের দিকে একবার শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েই ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, "বোসো! বোসো আমেদ সায়েব।"

আমেদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। গভীর দৃষ্টিতে শুভঙ্করকে দেখতে দেখতে বলল, "ব্যাপার কি ঘোষ? স্থান কাল

ভুলে এতটা তন্ময় হয়ে কী চিন্তা করছ ? আই অ্যাম্ সিঅর্ ইউ আর্ নট্ ইন লাভ্!"

শুভঙ্কর কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "ডোন্ট্ বি অ্যাবসার্ড্!"

আমেদ সকৌতূহলে প্রশ্ন করল, "ঈশ্বরচিন্তা ?"

শুভঙ্কর বিরস কণ্ঠে বলল, "অর্থচিন্তা।"

আমেদ দুহাতে সশব্দে টেবিল চাপড়ে বলল, "বিয্যালি ? হোয়েন্ ডিড্ ইউ কাম্ বাই ইয়র্ মিলিয়ন ?"

কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে আমেদ বলল, হোটেলে থেকে অত টাকা জমানো চলে না। হোটেল ছাড়ো। পেয়িং গেস্ট হও।"

শুভঙ্কর অস্ফুট স্বরে বলল, "পেয়িং গেস্ট! পরের বাড়িতে দিনের পর দিন—"

আমেদ বাধা দিয়ে বলল, "দুদিনে পর আপন হয়ে যায়। আমি এখনই দুটো বিজ্ঞাপন লিখে ফেলছি।"

শুভঙ্কর সবিস্ময়ে বলল, "দুটো ?"

আমেদ বলল, "হ্যাঁ। দুটো। একটা তোমার আর একটা আমার। যেখানে আমি পেয়িং গেস্ট, বিশেষ আরামেই আছি। টাকা জোর করে দিই। না দিলেও চলে। কিন্তু সেখানে একটু বেশি আপন হয়ে যাবার ফলে বিপদে পড়েছি।" কি কথা চিন্তা করে আমেদের মুখে একটা অর্থপূর্ণ হাসি ফুটল। বলল, "তোমাকে বলতে বাধা নেই, বন্ধুর সংসারে আছি। স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী। ছেলেপুলের বালাই নেই। এতে আমার আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু কার্যোপলক্ষে স্বামীটি প্রতি তিন মাসে কম করে দু'মাস বাইরে থাকেন। তখন সুন্দরী স্ত্রীটির চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব আমার। অন্তত আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমার এইরকম একটা ধারণা।"

শুভঙ্কর বলল, "তাতে তোমার আপত্তি কী ?"

আমেদ হাসতে হাসতে বলল, "আপত্তি আমার নয়। বন্ধুস্ত্রীর।

তিনি রক্ষা পেতে চান না। আমাকে তিলে তিলে বিপরীত ভূমিকার দিকে ঠেলছেন। আমি সামান্য অ্যামেচর্। নট রেডি ফর্ বিগ্ গেম্ ইয়েট্। যথাসম্ভব সরে পড়তে চাই।"

পরপর তিন দিন নিউ দিল্লীর তিনটি ইংরেজী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বার হল। এক ঝাঁক জবাব এল। তার কয়েকদিন বাদে শুভঙ্কর অফিসের টেবিলে চিঠিগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। কোনগুলির জবাব দেবে চিন্তা করছিল। আমেদের বিজ্ঞাপন ছাপা হবার আগেই তার সমস্যার সমাধান হয়েছিল। বম্বে হেড অফিস থেকে তার বদলির হুকুম এসে গিয়েছিল। অদৃষ্ট একদিন নিউ দিল্লী থেকে ছোঁ মেরে আমেদকে নিয়ে মাদ্রাজের মন্থরজীবনের স্তিমিত স্রোতে ফেলে দিল। যাবার সময় আমেদ শুভঙ্করকে বলেছিল, "তুমি আমি পেয়িংগেস্ট ব্যাপারে পার্টনার। আমাব অংশ তোমাকে বিনা শর্তে দিয়ে গেলাম।" শুভঙ্কর তাই আমেদের বিজ্ঞাপনের জবাবগুলোও পড়ে দেখছিল। পছন্দসই কোনো জবাব চোখে পড়ল না। অগত্যা নিজের বিজ্ঞাপনের জবাবগুলো সম্মুখে সাজিয়ে নিয়ে বসল। একটা চিঠির উপর চোখ পড়তে শুভঙ্কর সযত্নে চিঠিখানা তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। পুরু হাতে-তৈরী সৌখীন কাগজে তামাটে-সোনার এমবস করা কেল্লার নক্সা। তাতে ইংরেজী হরপে C-র সঙ্গে C জড়ানো মনোগ্রাম। তলায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হরফে লেখা Chaudhury Castle (চৌধুরী কাস্‌ল্)। নির্ভুল কেতাদুরস্ত ইংরাজিতে লেখা বিজ্ঞাপনের জবাব। পাকা হাতে টাইপ করা সাজানোগোছানো ছবির মতো চিঠি। এ চিঠি আমেদের নামে এলে ঈর্ষার কারণ হত। শুভঙ্কব স্থির করল আপাতত এই একখানা চিঠিরই জবাব দেবে। বাকী চিঠিগুলো টেবিলের একপ্রান্তে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্টেনোগ্রাফারকে ডাকবার জন্য বেল টিপতে যাবে, বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। শুভঙ্করের সামনে টেবিলে একটা ভিজিটিং

কার্ড রাখল। শুভঙ্কর বিস্মিত হল। কার্ডখানা চৌধুরী কাস্‌ল্‌ নামাঙ্কিত। এককোণে লালকালিতে লেখা "বিশেষ জরুরী।"

শুভঙ্করের নির্দেশে কামরার কপাট মেলে ধরতে যে ব্যক্তি দ্রুতপদে ঢুকে করমর্দনের জন্য ডান হাত এগিয়ে দিলেন, তাঁকে একবার দেখে ভুলে যাওয়া চলে না। সায়েবী পোশাকে সাজানো সুদর্শন ছিমছাম একটি মানুষ। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর চিঠিখানার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে।

শুভঙ্করের অনুরোধে সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে আগন্তুক বললেন, "আই অ্যাম্‌ সো সরি মিস্টার ঘোষ। আপনি ব্যস্ত মানুষ। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করা অন্যায় বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় ছিল না।"

শুভঙ্কর কোনো জবাব দেবার আগেই আগন্তুক বললেন, "আপনার সামনে আমাদের চিঠিখানা দেখে আরো অপ্রস্তুত বোধ করছি। হয়তো জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। আমাদেরও জবাবের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু কোনো কারণে ব্যাপারটা হঠাৎ জরুরী হয়ে পড়ায় আমাকে তাড়াহুড়ো করে আসতে হল।"

শুভঙ্কর হঠাৎ অনুভব করল তার কামরার মধ্যে এই চিঠিখানাকে কেন্দ্র করে একটি নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে উঠছে। সে বলল, "অত কিন্তুর প্রয়োজন নেই। আপনি এসে পড়ায় একদিক থেকে ভালোই হল। পেয়িংগেস্ট ও হোস্টের চাক্ষুষ পরিচয় হল।"

আগন্তুক বললেন, "সো কাইণ্ড অব ইউ! তবে আপনার একটা ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনার ভাবী হোস্ট নই। তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। আমি চৌধুরী এস্টেটের ম্যানেজার বিক্রম শা।"

শুভঙ্কর বলল, "একই কথা। আমার কাছে আপনিই চৌধুরী এস্টেট।"

বিক্রম শা বললেন, "আমার এই আকস্মিক আগমনের কারণ হচ্ছে এই যে, এই পেয়িংগেস্ট সংক্রান্ত ব্যাপারটা আমরা আজই মিটিয়ে ফেলতে চাই।"

শুভঙ্কর এই রকম একটা উক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলল, "আজই! চিঠিটা কিন্তু আমি আজই পেয়েছি।"

বিক্রম শা বললেন, "সেজন্যেই আমি প্রথমেই ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু আমি হুকুমের দাস। তাছাড়া, হুকুমের প্রশ্ন না উঠলেও আমাকে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর স্বার্থে আসতে হত।"

শুভঙ্কর অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করেছিল। প্রস্তাবটা শুধু অসমীচীন নয়, অবাস্তব, অস্বাভাবিক। ইতস্তত করে সে বলল, "কোথাও না কোথাও আমাকে পেয়িংগেস্ট হতেই হবে। আমার নিজের গরজ কম নয়। কিন্তু আজই কথা পাকা করতে গেলে আমার তো বটেই, আপনাদেরও অসুবিধে।"

বিক্রম শা বললেন, "আপনার বিশেষ অসুবিধে। আমাদের নয়। আমাদের প্রয়োজন এত বেশী যে অসুবিধার কথা চিন্তা করার সুযোগ নেই।" একটু থেমে শা বললেন, "আপনি বুঝতেই পারছেন যে চৌধুরী কাস্‌ল্‌ নিশ্চয়ই পেয়িংগেস্টের ব্যবসা খোলেনি। চৌধুরী কাস্‌ল্‌ পেয়িংগেস্ট চায় একথা কাগজে ছেপে দিলে নিউ দিল্লীর বাতাস কানাঘুষোয় ভারী হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলা দরকার।" একটু চিন্তা করে শা বললেন, "চৌধুরী রাজপরিবারে দীর্ঘকাল ধরে একটা প্রথা চলে আসছিল। প্রতিদিনই একজন না একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর সেবা করা হত। বছর পনেরো আগে এই প্রথা কিছুটা বদলে দিয়ে ব্যবস্থা করা হয় যে খোঁজখবর নিয়ে এমন ব্যক্তিকে স্থায়ী অতিথি হিসেবে আনতে হবে যিনি সব দিক দিয়ে রাজপরিবারেরই একজনের মতো মানিয়ে চলতে পারবেন। তিনি সসম্মানে থাকবেন। কিন্তু চালচলনে সর্বব্যাপারে তাঁকেও রাজপরিবারের মানরক্ষা করে চলতে হবে। ফলে চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে গত পনেরো বছর তিনটি অতিথি পর পর এসেছেন। তিনজনই বিশিষ্ট ব্যক্তি। নাম করলে সহজেই চিনবেন। প্রথম দু'জন কয়েক বছর কাস্‌ল্‌য়ে বাস করে জীবনের সায়াহ্নে বিদায়

নিয়েছেন। তৃতীয় ব্যক্তি কয়েকদিন হল মারা গেছেন। ফলে আজকালের ভিতরই চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে নতুন অতিথির প্রয়োজন।"

শুভঙ্কর উৎফুল্ল হবে, না বিচলিত হবে বুঝে উঠতে পারল না। দোয়ামনা করে বলল, "আমার দিক থেকে মস্ত দুটো বাধা দাঁড়াচ্ছে। প্রথমত আমি কোনোক্রমেই বিশিষ্ট ব্যক্তি নই। দ্বিতীয়ত আপনারা গেস্ট চান। কিন্তু আমি হতে চাই পেয়িং গেস্ট।"

শাকে এবার চিন্তিত মনে হল। শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বললেন, "আপনি কোন স্তরের মানুষ এ সম্বন্ধে আমার মতামতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যার হুকুমে আমি কথা চালাতে এসেছি তিনি আপনার শ্রেণী নির্ণয় করে আপনাকে অতিথি হিসেবে পেতে উৎসুক। আর শুধু হাতে আপনি চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর আতিথ্য গ্রহণ করে গলগ্রহ হতে চান না আপনার পক্ষে এইরকম মনোভাব খুবই স্বাভাবিক। কাস্‌ল্‌ আপনাকে পেয়িংগেস্ট হিসেবেই গ্রহণ করবে। প্রতি মাসেই আপনি বিল পাবেন। ঠিক অতিথি হিসেবে নয়। কাস্‌ল্‌-এর বিগ্রহ পূজার চাঁদার বিল।"

শুভঙ্কর সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "আন্দাজ কত টাকা?"

শা হেসে বললেন, "আপনার সাধ্যের সীমা ছাড়াবে না। এক টাকার কম নয়।"

শুভঙ্কর ঘোর অবিশ্বাসে বলল, "এক টাকা?"

শা শান্তকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ। তার বেশীও নয়।"

শুভঙ্করের মাথার উপর এবার বিস্ময়ের গোটা আকাশ ভেঙে পড়ল।

শা বিদায় নেবার আগে শুভঙ্করের মনের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জাল নিপুণ হাতে ধারালো যুক্তিতে কেটে দিয়ে গেলেন। শুভঙ্করের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করে অফিসের কি বাইরের কেউ নিশ্চয়ই অভিজাতমহলে কিম্বা সরাসরি চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এই তার সুখ্যাতি করে থাকবেন। কাজেই শুভঙ্করকে গেস্ট হিসেবে পাবার জন্য চৌধুরী

কাস্‌ল্‌-এর এই আগ্রহ প্রচ্ছন্ন পরিহাস বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শুভঙ্করের পক্ষেও চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। সে নিশ্চয়ই অনুগৃহীতের মতো মাথা হেঁট করে যাচ্ছে না। তার পূর্বে যাঁরা অতিথি হিসেবে গিয়েছেন তাঁদেরই মতো শ্রদ্ধার স্বীকৃতি নিতে যাচ্ছে। শা কয়েকটি নামী ব্যক্তির টেলিফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন। শুভঙ্কর টেলিফোনে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাঁরা একবাক্যে শা'র উক্তির সমর্থন করলেন। শেষে শুভঙ্করের আহ্বানে একসময়ে অফিসের বড়বাবু ঘরে ঢুকলেন। শুভঙ্কর ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে প্রশ্ন করতে বড়বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলেন কি স্যর! চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর ইজ্জত কি আজকের কথা? ওখানে এক ছুতোয় এক কাপ চা খেয়ে আসতে পারলে লোকে জাতে উঠে যায়। চৌধুরী কাস্‌ল্‌ আর হোটেল!"

শুভঙ্কর বলল, "মুস্কিল এই, আজ কথা পেড়ে আজই কথা চায়। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই টেলিফোনে হ্যাঁ না জানতে চায়।"

বড়বাবু শুভঙ্করের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর সঙ্গে কানেকশন করে রিসিভারটা তার হাতে তুলে দিলেন। শুভঙ্কর বুঝলো এতে শুধু যুক্তির নয়, অদৃষ্টেরও হাত আছে। সে না বলতে পারল না।

শুভঙ্কর যখন তার লটবহর নিয়ে কাস্‌ল্‌য়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সামনের পাথরে গাঁথা কেল্লার মতো উঁচু ভিত বিরাট বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে সদরমহলের বিশাল কপাটটার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালো, তার মনে হল কপাটের ওপাশে ইতিহাস তার জন্য অপেক্ষা করছে। কপাটটা খুলে যেতেই বিক্রম শা এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে অফিসে নিয়ে বসালেন। বললেন, "কয়েক মিনিট এখানে বিশ্রাম করুন। অন্দরে যেতে বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হবে।"

ম্যানেজার একটা সাদা চামড়া বাঁধাই সোনার পাতে এমবস করা খাতা শুভঙ্করের সামনে মেলে ধরলেন। তিনটি পাতা বাদ দিয়ে চতুর্থ পাতায় শুভঙ্কর তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে সই করল। সেই মুহূর্তে বিক্রম শা-র সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। গভীর স্বরে বিক্রম শা বললেন, "আপনার এখানে আসা সার্থক হোক। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হোক।"

শুভঙ্করের কানে এই অত্যুক্তি কৃত্রিম বলে ঠেকল। কিন্তু যেখানে হিসেবের খাতায় মুহূর্তে মুহূর্তে বড় রকমের অদলবদল চলছে সেই হৃদয় এই কথাটাকে একেবারে ঠেলে ফেলতে পারল না। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নতুন অধ্যায়? তার জীবনে?

দামী পেয়ালায় হাল্কা সৌখীন চা খেয়ে শুভঙ্করের মনে হল, সে যেন কয়েক মুহূর্তেই খানিকটা বদলে গিয়েছে। বিক্রম শা বললেন, "এই চা খাবার পর বাইরে যত ভালো চা-ই হোক, খেতে কষ্ট হয়। চা খাবার সময় কোনো কারণে বাইরে থাকতে হলে ডাঙায় তোলা মাছের মতো ছটফট করি।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্দর আপনার জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছে।"

পথ কখনো ঘরের ভিতর দিয়ে, কখনো ঘরের বাইরে পাথুরে দেয়াল ও জাফরি ঘেরা ঢাকা বারান্দা ধরে চলেছে। ঝাড় লণ্ঠন, রেশমী পর্দা, দেশী বিদেশী গালিচা ও ঢাল-তলোয়ারে সাজানো একটা রাজ্য। সবকিছু মিলে অতীতের দীর্ঘশ্বাসভরা একটা বিচিত্র নক্সা। যে ভাবুক মন এই কেল্লার ভিতর অতীতকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল তার ব্যক্তিগত ইতিহাসের আসল রূপটা যেন শুভঙ্কর এক একটা মুহূর্তে দেখতে পায়। কিন্তু যখনই সে অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে, সবকিছু ধোঁয়াটে অস্পষ্ট হয়ে যায়। শেষে অন্দরের একপ্রান্তে এসে বিক্রম শা দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "এখানে অতীত শেষ। বর্তমান সুরু। হয়তো ভবিষ্যতও।"

শুভঙ্করের চোখের সামনে আলোয় ঝলমল একটা বিচিত্র দোতলা বাড়ি ছবির মত ফুটে উঠল। আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু জ্যামিতি ঘেঁষা নয়। ইঁট কাঠ ও কাচের একটা চমক দেওয়া কবিতার মতো।

বিক্রম শা বললেন, "এ বাড়ির একতলায় আপনার সবকিছুর ব্যবস্থা। দোতলায় কে থাকেন শীঘ্রই জানবেন। আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। এ মহলে অনুমতি ছাড়া পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।"

শুভঙ্কর কোনো কথা বলার আগেই বিক্রম শা তার হাতে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ চাপ দিয়ে দ্রুতপদে যে পথে এসেছিলেন, ফিরে গেলেন।

দোতলা বাড়ির ভিতর থেকে এক নারীমূর্তি বার হয়ে এল। কাছে আসতে শুভঙ্কর দেখল তন্বী তরুণী। মাথায় আধখানা ঘোমটা। মুখ রেশমী-জালিতে ঢাকা। বোঝা যায় সুন্দরী। কিন্তু চেহারা চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে না। বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্ন বেশ। ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে তরুণী শুভঙ্করের আগে আগে চলল। শুভঙ্কর তার মহলে এসে ঢুকলো। বসবার ঘর, শোবার ঘর এবং ছোট লাইব্রেরী। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন মহল। জাকজমকের লেশ নেই। কিন্তু অতি সহজে অবলীলাক্রমে সুন্দর।

বসবার ঘরে একটা সোফায় বসতে বসতে শুভঙ্কর বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।" তরুণী মনে হল ঈষৎ হাসল। শুভঙ্কর বলল, "সবকিছু এত পরিপাটি সাজানো। ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর বাহাদুরী তো বটেই, কিন্তু আপনার হাতও এতে নিশ্চয়ই কম নয়।"

তরুণী কথা বলল না। ঈষৎ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল নূতন অতিথির প্রশংসায় সে কুণ্ঠিতা ও বিব্রত।

শুভঙ্কর বলল, "নিন্দা প্রশংসায় যাদের সমান অরুচি আপনি হয়তো তাদেরই একজন।"

তরুণী শুভঙ্করকে একবার গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিল।

শুভঙ্কর বলল, "নূতন অতিথির পক্ষে আমি সম্ভবত বিশেষ প্রগল্ভ হয়ে পড়েছি।"

এবার তরুণী ঈষৎ হেসে সবেগে ঘাড় নাড়ল।

বেপরোয়া হয়ে শুভঙ্কর বলল, "ভীষণ হেরে গেলাম। এতগুলো কথা বলেও আপনাকে দিয়ে একটা কথাও বলাতে পারলাম না। একটা হাঁ না বললেও আমার সম্মান রক্ষা হত।"

তরুণী শুভঙ্করের দুচোখে চোখ রেখে তার অধরোষ্ঠে তর্জনী রেখে ইঙ্গিত করল। কিসের ইঙ্গিত? সে কি মৌনী না মূক? না এই ইঙ্গিতের আড়াল থেকে কোনো গভীর রহস্য সাড়া দিচ্ছে? সেই মুহূর্তেই শুভঙ্করের কৌতূহলী মন অভাবিত এক রহস্যের অতলে তলিয়ে যেত, কিন্তু বাধা এল। বসবার ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। স্টাডি থেকে যে একটা এক্সটেনশন আছে শুভঙ্কর লক্ষ্য করে দেখেনি। তৎক্ষণাৎ রিসিভারটা তুলে নিল। ম্যানেজার বিক্রম শার কণ্ঠস্বর চিনতে কষ্ট হল না। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন। সেই সঙ্গে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন। ম্যানেজার হিসেবে সকলের আগে তাঁকেই ষোলো আনা নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেজন্য অতিথিমহলের প্রান্ত থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। শুভঙ্কর জবাবে বলল, "অতিথিমহলের ব্যবস্থার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আমি কল্পনায় আনতে পারি না। কিন্তু—।" ম্যানেজার শুভঙ্করের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "বুঝেছি।" তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা ক্রমশ পরিষ্কার হবে। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ডিনার তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুম থেকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে। তারপর মহারানীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আপনাকে একবার অন্দরমহলে যেতে হবে। আপাতত আপনি বিশ্রাম করুন। স্টাডির লাইব্রেরীতে ভালো বইয়ের অভাব নেই। এক-আধটা বই উল্টেপাল্টে বরং হাতের সময়টা কাটিয়ে দিন। গুড্ নাইট!"

শুভঙ্কর রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। ম্যানেজার আর একবার আশ্বাস দিলেন, "আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

কিসের চিন্তা? ভাবতে গিয়ে শুভঙ্কর নিরস্ত হল।

বিশাল ডাইনিং হল-এর মস্ত পরিপাটি সাজানো টেবিলে একা ডিনার খেতে খেতে শুভঙ্কর একটা বিষয় লক্ষ্য করে চমৎকৃত হল। শুভঙ্কর দেখল তার ভিতর অপরিসীম বিস্ময়েব কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব বা আতঙ্কের লেশমাত্র নেই। যদি তার মনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটা লেবেল আঁটতে হয়, তাতে বড় বড় হরফে লিখতে হবে "কৌতূহল।" সে নির্বিঘ্ন নিরাপদ। শুধু, তার প্রতিদিনের পরিচিত জগৎ থেকে তার অভিজ্ঞতার অতীত এক নূতন জগতে যাবার জন্য তাকে তৈরী হতে হচ্ছে। কেন? এই কেনই হচ্ছে তার একমাত্র প্রশ্ন।

ডিনারের শেষে রানীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শুভঙ্কর অন্দবমহলের দিকে রওনা হল। ঝাড়লণ্ঠনেব আলো কোথাও প্রখর, কোথাও নরম, কোথাও প্রায় অস্পষ্ট। এ যেন একই সময়ে নানাসময়েব ভিতর দিয়ে যাত্রা। তাব আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে সেই নীরব তরুণী। এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা, এঘর থেকে ওঘর করে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে তারা মহারানীর মহলে এসে পৌছল। শুভঙ্কর হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সময়ের একটা হিসেব ধবে দেখল ডাইনিং হল থেকে রানীমহল ছ'মিনিটের পথ।

রানীমহলে পৌছেই তরুণীর সঙ্গে শুভঙ্করের দৃষ্টিবিনিময় হল। মুখের ভাষা যখন নীরব চোখের ভাষা যে তখন কত স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুভঙ্কব টের পেল। সূক্ষ্ম রেশমী জালির আড়াল থেকে তরুণীর দুচোখ যেন সুগোপনে তার কানে কানে বলল, "তুমি পৌঁছে গিয়েছ। যেখানে তোমাকে আসতেই হত, এসেছ। এ আসায় তোমার হাত নেই। আমরা তোমাকে টেনে এনেছি। কেন?"

শুভঙ্কর কল্পনায় দেখল তরুণী অধরোষ্ঠে তর্জনী রেখে সেই "কেন"র রহস্যকে গাঢ়তর করে তুলছে।

দেয়াল থেকে দেয়াল সারা মেঝে পুরু নরম গালিচায় ঢাকা। পায়ের তলায় মেঝে নরম বুকের মতো কাঁপে। শুভঙ্কর তরুণীর নির্দেশে ঘরের মাঝখানে একটা সাবেকী আমলের বিচিত্র নক্সার মখমলে মোড়া কৌচে গিয়ে বসল। মাথার উপর নানা রংয়ের কাচের বিশাল পদ্মঝাড়। জহরতের অলঙ্কারের মতো নিপুণ হাতে তৈরী। নানা রংয়ের আলো মিশে সৃষ্টির এক আশ্চর্য উষাকে ডেকে এনেছে।

শুভঙ্করকে ঘরে বসিয়ে তরুণী প্রস্থান করেছিল। শুভঙ্কর সৌখিন ঘরটা চোখ ভরে দেখতে দেখতে টের পেল চোখেই হোক মনেই হোক একটা নেশা যেন কোথাও ধরেছে। কতক্ষণ এ ভাবটা তার ছিল, হিসেব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ নারীকণ্ঠ তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ঘরে কারো আবির্ভাব ঘটেনি। তার সম্মুখে হাত দশেক তফাতে স্ফটিকের জাফরি। তারই ওধার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"মিস্টার ঘোষ: নানা কারণে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে এতটা দেরী হল, মার্জনা করবেন। আপনি চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

এদিকে সেদিকে তাকিয়ে অর্ধবিহ্বল অবস্থায় শুভঙ্কর উঠে দাঁড়াতে গেল। জাফরির ওধার থেকে কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল, "বসুন মিস্টার ঘোষ। অন্দরমহলের চিরাচরিত প্রথামতো আমাকে আড়ালে থাকতে হচ্ছে। সম্মুখে এসে অভ্যর্থনা করতে পারছি না। আড়াল থেকে নমস্কার জানাচ্ছি। গ্রহণ করবেন।"

শুভঙ্কর কী জবাব দেবে কোন্ প্রশ্ন করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে মহারানী বললেন, "এই কয়েক ঘণ্টায় নিশ্চয়ই আপনি বিব্রত বিপন্ন বোধ করছেন। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর অতিথি মহল থেকে সুরু করে অন্দরমহল আপনার কাছে

হয়তো আগাগোড়া আজগুবি ঠেকছে। কিন্তু যা আপনার চোখে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে, তাই হচ্ছে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর আসল চেহারা। অল্প সময়ে এখানকার জীবনযাত্রার যতটুকু দেখেছেন তাতে কোনো ভেজাল নেই। কয়েক শ বছর ধরে তিলে তিলে যে জীবনের ছক সম্পূর্ণ হয়েছে, তারই একটা অংশ। যখন সবটা দেখবেন কোথাও কোনো অসঙ্গতি আছে বলে মনে হবে না।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মহারানী বললেন, "মিস্টার ঘোষ, অতিথিমহলে আপনার বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আশা করি।" তারপর হেসে উঠে বললেন, "এ রকম আশা করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই উচিত নয়। হোটেলের সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন থেকে আমাদের অতিথি মহলের নিয়মের শাসনে পড়ে নিশ্চয়ই অস্বস্তিবোধ করছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে নিয়মের এই বাড়াবাড়িটাই একদিন অতিথিমহলে আপনার জীবনে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে। আপনার আগে এখানে যারা ছিলেন, তাঁরাও প্রথমে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু পরে প্রাণ পণ করে অতিথিমহলে জীবন আকড়ে ধরেছিলেন। বাইরের নানা প্রলোভনেও তারা অতিথিমহল ছাড়তে পারেননি।"

শুভঙ্কর কী বলবে না বলবে, মহাসমস্যায় পড়ে গেল। মহারানী নিশ্চয়ই আশা করছেন, সে একবার মুখ খুলবে। ভদ্রতার খাতিরে অন্তত দু'চার কথা বলা দরকার। মহারানী যেন তার এই সমস্যা আচ করেই কথার খেই টেনে বললেন, "মিস্টার ঘোষ, আপনাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেন আমি অনর্গল বকে চলেছি, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর একটা বিশেষ বক্তব্য আছে। এতক্ষণ ধরে তার গোড়ার অংশটা জানাবার চেষ্টা করেছি। সংক্ষেপে কথাটা এভাবে বলা চলে, আপনি এখানে বাইরের জগতের সঙ্গে কী সম্পর্ক রাখবেন কীভাবে চলবেন সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আপনার আসাযাওয়ার উপর কোনোরকম হস্তক্ষেপ

করা হবে না। শুধু দুটি নিয়ম আপনি পুরোপুরি মেনে চলবেন। অতিথিমহলে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। আপনার মহলের ভার যার উপর, অর্থাৎ যে তরুণী আপনার দেখাশোনো করবে তাকে আপনি যে হুকুমই দিন, সাধ্যমতো পালন করবে। কোনো বিধিনিষেধের আপত্তি সে তুলবে না, তোলার অধিকার তার নেই। কিন্তু অতিথিমহলে সে সম্পুর্ণ মৌনী। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলার অধিকারও তার নেই। এই নিয়ম যাতে সে পুরোপুরি মেনে চলে, সে দায়িত্ব শুধু তার নয়, আপনারও। অন্তত আপনি কখনোও, প্রয়োজন যত গুরুতর হোক না কেন, তাকে নিয়ম ভাঙতে প্রলুব্ধ করবেন না। আভাসে ইঙ্গিতে সে আপনার সঙ্গে নিঃশব্দে কথা বলবে। কয়েক বছর ধরে অতিথিমহলে কাজ করার ফলে এ ব্যাপারে ওর একটা সহজপটুত্ব এসে গিয়েছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। যদি কোনো জরুরী প্রয়োজনে মুখের কথায় কোনো জবাব পেতে চান, অফিসে টেলিফোন করবেন। এ বিষয়ে বিক্রম শাকে আমি বলে রেখেছি।"

সে রাতের মতো রানীমহলের দরবার শেষ হল, জাফরি-দেয়ালের ওধারে দীর্ঘ নীরবতায় শুভঙ্কর বুঝতে পারল। সে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্র-চালিতের মতো জাফরির ওধারে মহারানীর উদ্দেশে নমস্কার জানালো। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "রাত হল। আপনি ক্লান্ত। আশা করি অতিথিমহলে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না।"

আসতে আসতে শুভঙ্করের মনে হল মহারানী জাফরির ওধারে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমাদের অনেককেই কখনো কখনো দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগতে দুটো পা দিয়ে একই সময়ে দুরকমের দুটো জীবনে ঢুকে যেতে হয়। আমরা তখন দু'খণ্ড হয়ে আমাদের ভিতর যাকে ধরাছোঁয়া যায় না সেই অদৃশ্য সত্তাকে আঁকড়ে ধরে এক বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর বেঁচে

থাকি। এ দ্বন্দ্ব কখনো নির্মম হানাহানিতে পৌঁছয়, কখনো অদৃশ্য সত্তার দরবারে দীর্ঘ শালিসীতে ঢিমেতালে চলে। শুভঙ্করের ভিতর এই রকমের একটা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল। রানীমহল থেকে তরুণীর পিছু পিছু অতিথি মহলে আসতে আসতে তার ভিতরের দ্বন্দ্ব পটে-আঁকা একটা দ্বৈরথের মতো তার সম্মুখে ফুটে উঠল। সে দেখল নিউ দিল্লী, তার হোটেল, তার অফিস পা টিপে টিপে তার ভিতর ঢুকে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ভিতরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে পাতালের দৈত্যের মতো উঠে এল চৌধুরী কাস্‌ল্‌, তার রানীমহল ও অতিথিমহল। দুদিক থেকে তারা তার দুটো হাত চেপে ধরল। তার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সারাটা পথ এল।

রাতের ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে তরুণী বিদায় নিয়েছিল। উপরতলায় তার থাকবার ব্যবস্থা, স্টাডির গা ঘেঁষে উপরে সিঁড়ি চলে গিয়েছে। সে যে-কোনো সময়ে অবাধে স্বচ্ছন্দে এসে অতিথির খোঁজখবর নিতে পারে, সেজন্য এই ব্যবস্থা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তরুণী পিছন ফিরে একবার তাকিয়েছিল। শুভঙ্কর নির্নিমেষে তাকে লক্ষ্য করছে, দেখেছিল। মুহূর্তের জন্য যেন সে যেতে যেতে থেমেছিল। সন্ধ্যায় প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে শুভঙ্কর তার মুখে রেশমী জালির আড়ালে যে বিষণ্ণ হাসি দেখেছিল, এক নিমেষের জন্য তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

বিছানায় শুতে না শুতেই শুভঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল, হিসেব ছিল না। হঠাৎ শুভঙ্কর জেগে উঠল। মুহূর্তের ভগ্নাংশে গভীর নিদ্রা থেকে ষোলো আনা জেগে ওঠার অভিজ্ঞতা যে-কোনো স্থানে যে কোনো সময়ে তার মনে বিস্ময়ের পর্দায় ঘা দিত, কিন্তু অতিথি মহলে প্রথমরাত্রে এই অভিজ্ঞতা তার কাছে একটা বিপদের সংকেত নিয়ে এল।

শুভঙ্করের মনে হল সে একা নয়। কারো বিশেষ উপস্থিতির ফলে ঘরের আবহাওয়ায় যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছে। এই উপস্থিতি

অহেতুক নয়। লক্ষ্যস্থল শুভঙ্কর। শুভঙ্করের একসময়ে মনে হয় কে যেন তার দুচোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

শুভঙ্কর প্রশ্ন করতে গেল। কণ্ঠ সাড়া দিল না। বিছানার বেডল্যাম্পের সুইচ। হাত তুলতে গিয়ে দেখল হাত অসাড়। এই সময়ে সে টের পেল পায়ের তলায় ভাঁজ করা চাদরটা কে সন্তর্পণে তার গায়ে টেনে দিচ্ছে। এই স্থূল স্পর্শে তার দেহ ও মনের সকল অনুভূতি ও বৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠল। সে বেডল্যাম্পের সুইচ টিপল। আলোয় ঘর ভরে গেল। যেতে যেতে কপাটের কাছে তরুণীকে থামতে হল। শুভঙ্করের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে সে অঙ্গুলী নির্দেশে গায়ের চাদরটা দেখালো। শুভঙ্করকে দ্বিতীয় প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে সে ক্ষিপ্রপদে স্টাডিতে ঢুকে গেল। নিস্তব্ধ রাতে শুভঙ্কর তরুণীর দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। শুভঙ্করের হৃৎপিণ্ডে ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল।

পরদিন সকালে চায়ের পর্ব শেষ হতে না হতেই স্টাডির টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই ম্যানেজার বিক্রম শার গলা শোনা গেল। গুড্‌মর্ণিংয়ের জবাবে গুডমর্ণিং বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে তুলে নিল। বিক্রম শার গলা তখনও শোনা যাচ্ছে।

বিক্রম শা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, "আই অ্যাম্‌ ভেরি টাচি অ্যাবাউট্‌ মাই ভয়েস্‌। আমার গলা শুনতে পেয়ে আপনি যে ভাবে রিসিভার নামিয়ে নিলেন, মনে হল আই হ্যাভ্‌ ড্যামেজ্‌ড্‌ ইঅর হিয়ারিং অ্যাপারেটাস! যাহোক, যথাসম্ভব খাটো গলায় বলছি।"

শুভঙ্করকে কাষ্ঠহাসি হাসবার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত সুযোগ দিয়ে বিক্রম শা বললেন, "টেলিফোন করলাম, ভাবলাম আপনার খবরটা নিই। অতিথিমহলে প্রথম রাতটা কিরকম কাটলো! ঘুম হয়েছিল তো?"

শুভঙ্কর জবাবে হ্যাঁ বলাই সঙ্গত বোধ করল।

বিক্রম শা বললেন, "নতুন জায়গায় গিয়ে আমার তো চোখের ঘুম উবে যায়। তা ছাড়া আমার নানা উপসর্গ, নানা ভয়।"

শুভঙ্কর বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "ভয়?"

বিক্রম শা বললেন, "আপনাকে খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই মিস্টার ঘোষ। মিলিটারী সার্ভিসে ছিলাম। আমি চোরডাকাতের পরোয়া করি না। আমার ভয় হচ্ছে ভূতের! যেখানেই যাই ওই ভয়ে মরি।"

শুভঙ্করকে টেলিফোনে হাসতে শুনে বিক্রম শা বললেন, "আই অ্যাম্ নট্ জোকিং মিস্টার ঘোষ। ভূত না থাকলেও ভূতের ভয়টা তো আছে! প্রথম রাতটা আপনার কি ভাবে কাটে, কাল রাতে খুব ওরি করতে শুরু করেছিলাম। কোনো উৎপাত উপদ্রব হয়নি নিশ্চয়ই?"

শুভঙ্করের দিক থেকে কোনো একটা জবাব আশা করে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিক্রম শা বললেন, "আই ফিল্ সো রিলিভ্‌ড্।" তাঁর হতাশা তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল। বিক্রম শা চেষ্টা করেও পুরোপুরি ঢাকতে পারলেন না। পরে গলা নামিয়ে বললেন, "যদি কোনো কথা থাকে—আমি ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু আপনার প্রয়োজনের বেলায়—"

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করেও শুভঙ্করকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর দেখে বিক্রম শা বললেন, "দেন্ ইউ আর শিওর ইউ ঔ'ট্ কাম্ ফর্ এ চ্যাট্!"

শুভঙ্কর বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমাকে এখন শেভ্ স্নান ইত্যাদি সেরে অফিসে যাবার জন্য তৈরী হতে হচ্ছে। পরে দেখা হবে, কথা হবে।"

শুভঙ্কর স্থির করেছিল অতিথিমহলে ও রানীমহলে প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্তে পৌছবে না। চৌধুরী কাস্‌ল্-এর কারো কাছে মন খুলে ধরা তো দূরের কথা!

শুভঙ্কর স্নান সেরে শোবার ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হল। টাই শার্ট গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি বেছে ওয়াড্রোব থেকে নিয়ে তরুণী ভাঁজ খুলে বিছানার উপর পরিপাটি বিছিয়ে রেখেছে। শুভঙ্কর ঘরে ঢুকতেই ওয়াড্রোবের একটা পাল্লা খুলে টাঙানো স্যুটগুলোর উপর একটা হাত আলগোছে বুলিয়ে নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। শুভঙ্করের দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটা ছাই রঙের স্যুট বার করে নিয়ে নিপুণ হাতে ঝাড়তে লাগল।

শুভঙ্কর এবার না হেসে থাকতে পারল না। বলল, "আপনাকে এ সব কাজে যেমন পাকাহস্ত দেখছি, মনে হয় আগের জন্মে আপনি নিশ্চয়ই কোনো বড় সাহেবের খাসবেয়ারা ছিলেন।"

তরুণী হেসে দিল। পরে শুভঙ্করের উক্তির সমর্থনে ঘাড় নাড়ল।

শুভঙ্কর বলল, "আপনি যে শুধু কথা বলতে জানেন না তা নয়, দেখছি রাগতেও পারেন না। আমি হলে অস্ত্রাভাবে অন্ততঃ ব্রাশটা ছুঁড়ে মারতাম।"

হঠাৎ তরুণীর আচরণে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল। সে কৃত্রিম কোপে সত্যই ব্রাশটা তুলে নিয়ে শুভঙ্করকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে গেল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। শুভঙ্করের দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে ত্রস্তে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

ব্রেকফাস্ট সেরে শুভঙ্কর অফিসে যাবার আগে একবার শোবার ঘরে এল। বিছানার উপর এক টুকরো কাগজ চোখে পড়ল। মেয়েলী হাতে ইংরেজীতে লেখা। বক্তব্য এই—প্রায় আত্মবিস্মৃত হতে বসেছিলাম। অসঙ্গত আচরণের জন্য ক্ষমা না চেয়ে পারছি না। ব্যাপারটা মহারানীর কানে উঠলে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। সে যা হোক, মহারানীর ছোট বোন আপনাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। মহারানীর অনুরোধ, যাবেন। আপনার ভাল লাগতে পারে। ক্লাবের ঠিকানা দিলাম।

কাগজটা তুলে নিয়ে শুভঙ্কর একাধিকবার পড়ল। তারপর গুলি

পাকিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে কী ভেবে কোটের ডান পকেটে রাখল। নিউ দিল্লীর খরস্রোত প্রশস্ত জীবনপ্রবাহের একধারে অলক্ষিত অজ্ঞাত আর একটি প্রবাহে সে প্রায় ভাসমান এ রকম একটা আশা বা আশঙ্কা তার হল। পলকা ডিঙিতে না মধুকরে, সে বিষয়ে অবশ্য সে মুহূর্তে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাবার উপায় তার ছিল না।

টাকা জমানোর নেশার মতো শুভঙ্করের আর একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল। কাজের নেশা। বিশ্বাস বললে ভুল হবে। তার জন্মগত একটা সংস্কার ছিল কাজই হচ্ছে আসলে জীবনের সবচেয়ে বড় রোজগার। পরের কাজকেও নেশার টানে নিজস্ব, ব্যক্তিগত কাজে রূপান্তরিত করার একটা দুর্লভ ক্ষমতা থাকার ফলে যে-কোনো কাজে সে কয়েক মুহূর্তের ভিতর আসক্তির শেষ সীমায় চলে যেতে পারত। অফিসে পৌঁছে কামরায় ঢুকবার পর ফাইলে হাত দিতে তার এক মিনিটও বিলম্ব হত না। যদি কখনো কোনো অত্যাবশ্যক ফাইল বা কাগজপত্রের জন্য তাকে কয়েক মিনিটও হাত উঁচিয়ে বসে থাকতে হত, জুয়ার আড্ডায় স্থানাভাবে অপেক্ষমান জুয়ারীর মতো তার দশা হত।

সেদিন কিন্তু শুভঙ্করের কার্যকলাপে এই প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কামরায় ঢুকে সন্তর্পণে চেয়ারটা টেনে বসল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মনের লাগাম আলগা করে দিয়ে একটা বিশেষ চিন্তার মন্দস্রোতে ভেসে চলল।

শুভঙ্কর কামরায় ঢুকল, সুদীর্ঘ পাঁচ মিনিট কেটে গেল, অথচ তারস্বরে টেবিলের ইলেকট্রিক বেল বাজল না, তার খাসবেয়ারা এই অসম্ভব অঘটনে বিস্মিত হয়ে কামরার কপাটটা একটু ফাঁক করে ধ্যানমগ্ন শুভঙ্করকে দেখে সন্তর্পণে বন্ধ করে দিল। খানিকবাদে বড়বাবু একবোঝা ফাইল বগলে কামরার সম্মুখে আসতে সে রহস্যজনকভাবে মাথা নাড়ল। বড়বাবু তার এই ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে

কামরায় ঢুকে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। বড়বাবুর আবির্ভাব শুভঙ্করের দৃষ্টি এড়ায়নি। জিজ্ঞাসুচক্ষে তাকাতে বড়বাবু ফাইলগুলি স্তূপাকার করে টেবিলের একপাশে রেখে বললেন, "কাল যে দুটো জরুরী বিষয়ের উপর নোট দিতে বলেছিলেন, উপরের ফাইলে পিন দিয়ে এঁটে দিয়েছি। বাকী ফাইলগুলোতেও অনেক ইনফরমেশন্ আছে।"

শুভঙ্করের আচরণে কোনো ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। ধীর স্বরে বলল, "রেখে যান। দেখে রাখব।"

যেতে গিয়ে বড়বাবু থেমে গেলেন। ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যর, আশা করি চৌধুরী কাস্ল্-যে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।"

শুভঙ্করের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা গেল। বড়বাবুর দিকে না তাকিয়েই বলল, "আপাততঃ না। তবে একটা রাত তো মাত্র কাটালাম!"

বড়বাবু বুঝলেন তাঁর জানবার কথা নয় এ রকম কোনো কারণে এটা হচ্ছে অলমতিবিস্তরেণচিহ্নিত মন্তব্য। বড়বাবু কামরা থেকে বার হয়ে এলেন।

চৌধুরী কাস্ল্-এর অধিশ্বরীর কনিষ্ঠা ভগ্নী অনূঢ়া অলকা চৌধুরীর ক্লাব খুঁজে নিতে শুভঙ্করের বিশেষ বেগ পেতে হল না। নামে ও ঐশ্বর্যে ভারী এক বিশেষ অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ক্লাব যে শুধু রাজধানীর সামাজিক জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে তা নয়, সাবেকী আমলের ঐতিহ্যস্মারক একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছে। মন্দিরের চত্বর থেকে হঠাৎ অভ্যন্তরে যাবার মুহূর্তে মন একটা সভয় সম্ভ্রমে সতর্ক হয়ে ওঠে। অলকা চৌধুরীর ক্লাবের বারান্দায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শুভঙ্কর তার মনে অনুরূপ একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল।

অলকা চৌধুরী নিশ্চয়ই বিশেষ করে তার প্রতীক্ষায় ছিল। বেয়ারার হাতে শ্লিপ পাঠানোর দু' মিনিটের ভিতরই সে এদিকে

ওদিকে তাকাতে তাকাতে শুভঙ্করকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে বলল, "ইফ আই অ্যাম নট্ সো রং, আপনিই মিস্টার ঘোষ?"

শুভঙ্কর তার উক্তি সমর্থন করে ঘাড় নাড়তে সে তার দু'চোখের উজ্জ্বলদৃষ্টিতে শুভঙ্করকে খানিকটা তপ্ত করে দিয়ে বলল, "আমি পুরো দশ মিনিট আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।" শুভঙ্করের ডান হাতে একটা হাল্কা টান দিয়ে বলল, "আসুন। কোথাও কিছুক্ষণ একটু নিরিবিলি বসা যাক। খাওয়াটা নিতান্তই একটা আসুরিক ব্যাপার। বাঁচতে গেলে এড়ানো চলে না। দু' দশ মিনিট দেরী হলে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হবে না?"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "না না।" কিন্তু প্রথম পরিচয়ে অলকা চৌধুরীর এই অপ্রত্যাশিত উষ্ণতায় একটু বিস্মিত হল।

লম্বা বারান্দায় এধারে ওধারে টেবিলে ক্লাবের সভ্যরা ও তাদের নিমন্ত্রিতেরা আহার পর্বের গোড়ার পান-ক্রিয়া সেরে নিচ্ছিলেন। বারান্দার শেষ প্রান্তে দ্রুতলঘু পদক্ষেপে অলকা চৌধুরী তার অতিথিকে একটি খালি টেবিলে বসিয়ে বলল, "এক মিনিট। এখুনি আসছি।" তার অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাবের ফাঁকে ঘড়ির কাঁটা পুরো এক মিনিটও এগোলো কি না সন্দেহ। একটা লক্ষ্যসিদ্ধ ঢেউয়ের মতো শুভঙ্করের উল্টো দিকের চেয়ারে হাল্কা ছন্দে আছড়ে পড়ে অলকা চৌধুরী বলল, "আমি বড় তড়বড়ে, না? দাদু এজন্য আমার নাম দিয়েছিলেন হরিণী।"

শুভঙ্কর না বলে পারলনা, "চমৎকার নাম! একেবারেই নতুন।"

অলকা চৌধুরী আক্ষেপের অপরূপ অভিনয় করে কপাল চাপড়ে বলল, "কিন্তু এমনই আমার দুর্বদৃষ্ট! নামটা টিকল না।"

শুভঙ্কর অকারণ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

অলকা চৌধুরী ঠোঁট উল্টে বলল, "মা বেঁকে বসলেন। বললেন, হরিণী তো জন্তু! আমার মেয়ে হরিণী হতে যাবে কোন্ দুঃখে!"

শুভঙ্কর বলল, "আমি হলে কিন্তু ঐ নাম ছাড়তাম না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "নাম ছেড়েছি। কিন্তু নামের সত্যটা ছাড়িনি। আমি যখন ক্লাবের বারান্দায় হানা দিই, আমার চেনা লোকেরা সবাই পথ ছেড়ে দেয়।

টেবিলে পানীয় পৌঁছে গিয়েছিল। কাটগ্লাসের দুটি সৌখীন পানপাত্র। একটি শুভঙ্করের সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে অলকা চৌধুরী বলল, "আপনাকে দেখলে সুরাসাধক সম্প্রদায়ের কেউ বলে মনে হয় না। আপনি বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে তৈরী আপেলের নির্দোষ রস পান করুন। আমি শেরীতে মন অর্থাৎ রসনা দিই।"

শুভঙ্কর একটা হাল্কা চুমুক দিয়ে একবার পানপাত্রের, একবার অলকা চৌধুরীর দিকে তাকালো।

অলকা চৌধুরী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "ভুলটা ইচ্ছাকৃত। তবে শেরী পানে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। আমার ভাগ্যে অবশ্য আপেলের রসই জুটেছে। আমার দৌড় শেরী পর্যন্তও নয়।"

শুভঙ্করকে নীরব দেখে অলকা চৌধুরী বলল, "নারীজাতির কর্তব্যের ব্যাপারে আমি বাইবেল মেনে চলি। তবে গতানুগতিক প্রথায় নয়।" আর একটু আপেল রসে রসনাসিক্ত করে অলকা চৌধুরী বলল, "ইভ-য়ের ট্র্যাডিশনে আমার সম্পূর্ণ আস্থা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নারীর জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য পুরুষকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানো। জীবনের নাটকটা ইভ-য়ের যুগে যেমন, এখনও তেমনি হওয়া উচিত।"

শুভঙ্কর অলকা চৌধুরীর উক্তিতে স্তম্ভিত, সেইসঙ্গে একটু পুলকিতও হল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু তার কথার পিঠে একটা কথা না রাখতে পারলে শুভঙ্করের পৌরুষে আঘাত লাগছিল। মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু পাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়ে ফল খাওয়ানোর চেষ্টায় বিপরীত ফল ফলতে পারে।"

অর্থপূর্ণ হাসি ও দীপ্ত-উজ্জ্বল দৃষ্টিতে শুভঙ্করকে ধাঁধিয়ে দিয়ে অলকা চৌধুরী বলল, "আমি কি অন্ধ?"

যথাসময়ে, খনিকটা অসময়েই, অলকা চৌধুরী শুভঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে লাঞ্চের টেবিলে হাজির হয়েছিল। প্রথামত স্যুপ দিয়ে লাঞ্চ সুরু হয়েছিল। স্যুপ শোষণ করতে করতে সে শুভঙ্করকে বারবার আড়চোখে দেখছিল। তাকে অন্যমনস্ক ও চিন্তারত দেখে তার ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। শুভঙ্করের সঙ্গে তার সাক্ষাতের অর্থ কি শুভঙ্কর জানে? শুভঙ্কর কেন, চৌধুরী কাস্‌লের দুচারজন বাদে কারোই জানার কথা নয় এই বিচিত্র সত্য, এই হাসির উৎস। লাঞ্চের গোড়ার দিকের নিঃশব্দ নৈকট্য সে রীতিমতো উপভোগ করছিল। তার মনে হচ্ছিল শুভঙ্কর একটা নতুন দেশ এবং সে সেই নতুন দেশের প্রথম আগন্তুক মানুষ, মূল অর্থে আবিষ্কারক, উপেক্ষণীয় পর্যটক নয়। তবুও এই নির্বাক সঙ্গ রীতিবহির্ভূত। শুভঙ্করের মনের আবহাওয়াটা খানিকটা হাল্কা করার চেষ্টা করা দরকার।

অলকা চৌধুরী বলল, "চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর জালে জড়িয়ে জীবন কতটা উপভোগ করছেন, কতটা ছটফট করছেন?"

শুভঙ্কর এই প্রশ্নে চমকে উঠল। অলকা চৌধুরীর সারা মুখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক হবার প্রয়াসে জবাব দিল, "এখনো অতটা এগোতে পারিনি। উপভোগ বা ছটফটানির দৃশ্য আসতে এখনো ঢের দেরী।"

অলকা চৌধুরী বলল, "মহারানীর একটা ধারণা অতিথিরা ঢুকতেই তাকে একটা জটিল জীবন-জালের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করে একটা পছন্দসই নাটকের অপেক্ষায় থাকেন।"

শুভঙ্কর যথাসাধ্য বুদ্ধি প্রয়োগ করে মন্তব্য করল, "মহারানীর ধারণার মূলে অভিজ্ঞতার জোর আছে। ব্যক্তিগত অভিরুচির কথা বাদ দিলে আমার কোনো জোরই নেই। সেক্ষেত্রে আমার ধারণার মূল্য কী?"

অলকা চৌধুরী বলল, "অভিরুচি যখন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি হয়ে দেখা দেয়, অভিজ্ঞতার জোর তার কাছে হার মানে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি ঋষি, তান্ত্রিক বা নেপোলিয়ন নই। আমার ইচ্ছাশক্তি সহজ রাস্তায় কদমতালে চলে।" একটু ভেবে সে বলল, "হঠাৎ অদ্ভুত সর্তে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর অতিথি গণ্য হয়ে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু যে-ঘটনা আমার কাছে পরম বিস্ময় তা চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর ইতিহাসে নিয়ম রক্ষার একটা তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এই রকম একটা যুক্তির আশ্রয়ে সহজ জীবনে দিব্যি টিকে আছি।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আপনি তা-ই মনে করেন?" তারপর শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি চমৎকার কথা বলেন। এই মন নিয়ে কী করে অফিসে দশটা পাঁচটা কাজ করেন?"

শুভঙ্কর প্রতিবাদ করল। বলল, "আমার মন? না, আমার মনের বড়াই নেই। আমি তো নিজেকে কাজের একটা নিছক যন্ত্রের চেয়ে বড় করে কখনো দেখিনি।"

অলকা চৌধুরী বলল, "ওখানেই আপনার ভুল। মহারানী-দিদি অতিথি নির্বাচনে ভুল করেননি।" একটু থেমে কোনো একটা বিশেষ চিন্তার সূত্র ধরে বলল, "সব শুঁয়োপোকাই আর প্রজাপতি হয় না। বিশেষ করে তারা যারা শুঁয়োপোকা হিসেবে পাকা ঝানু হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সম্মুখে তারা দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলে দেয়। যারা সহজ, নরম, যাদের ভিতরটা প্রকৃতি সহজে ধরতে ছুঁতে পারে, তাদেরই রূপান্তর ঘটে।"

শুভঙ্কর নিজেকে প্রশ্ন করল, তার ক্ষেত্রে এ কথার অর্থ কী? সঙ্গতি কী? অলকা চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দেখল তার মুখ এক দুর্লভ হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে। এই হাসি তাকে কেন, হয়তো আমেদের মতো পাকা ঝানু লোককেও রূপান্তরের আশ্চর্য স্বপ্নে জাগাতে পারে।

বিদায় নেবার সময় শীঘ্রই দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে

শুভঙ্কর ছুটি পেয়েছিল। অফিসে ফিরে এসে সে তার নতুন চিন্তাব অনভ্যস্ত পথ থেকে সরে গিয়ে কাজে ডুবে গেল। নেশা যত পুরোনোই হোক নেশাই থাকে। কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে শুভঙ্কর ফাইলের একএকটা পাহাড় স্বচ্ছন্দে আনন্দে ডিঙিয়ে যেতে লাগল। বড়বাবু কয়েকবার কামরার কপাট ফাক করে শুভঙ্করের একাগ্র ব্যস্ততা দেখে গিয়েছিলেন। সওয়া চারটে নাগাদ সন্তর্পণে ঢুকে গলা নামিযে নিয়ে বললেন, "বাঁ ধারের ফাইলগুলোব কাজ কি শেষ হল, স্যর?" শুভঙ্কর মাথা নাড়তে তিনি আবার বললেন, "ভাবতেই পারিনি অর্ধেক ফাইল দেখে নেওয়া সম্ভব হবে। এতে খুব সুবিধে হল স্যর।"

শুভঙ্কর মাথা না তুলেই বলল, "কিসেব সুবিধে?"

বড়বাবু বললেন, "সামনেব সপ্তাহে চেয়ারম্যান আসবেন শুনছি। চিঠি হয়তো দু একদিনেব ভিতবই আসবে। কেসগুলোর সীমা সা তাব আগে হয়ে গেলে অফিসের একটা ক্রেডিট হয়।"

শুভঙ্কব নির্লিপ্ত স্বরে বলল, "তার অনেক আগেই শেষ হবে।"

বড়বাবু চলে যেতে শুভঙ্কর কয়েক মিনিটেব ভিতবই অবশিষ্ট ফাইলগুলো দেখে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল। ধূমপানে সে অভ্যস্ত নয়। তবুও কখনো সখনো শখ মেটাতে সে পাইপ টানত। হয়তো ঠিক সখ মেটাতে নয়। গাছের শিকড় থেকে কুঁদে বার করা দুষ্প্রাপ্য একটা পাইপ সে তাব এক ইংরেজ বন্ধুর কাছ থেকে উপহাব পেয়েছিল। এই পাইপ আফিংখোরেব কৌটোব মত সে সদাসবদা সঙ্গে নিয়ে ফিরত। এই পাইপ মুখে ধরতে না ধরতে সে প্রাচীন শিকড়ের ঘ্রাণেই হোক কিম্বা কল্পিত কোনো আকর্ষণে হোক জীবনের নানা দ্বন্দ্বের একটু উঁচুতে উঠে মনুষ্যজাতির কর্মজগৎকে একজোড়া ভিন্ন চোখ দিয়ে দেখতে পারত।

শুভঙ্কর পাইপ মুখে দেবার কিছুক্ষণের ভিতরই তার মাথায় একটা চিন্তা এল। ঘন ঘন পুরোদমে পাইপ টানা সত্ত্বেও চিন্তাটা চাপা

পড়ল না। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে কলসীর মুখ খুলতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে হঠাৎ যে-এক দৈত্য আবির্ভূত হয়েছিল, চিন্তাটা তার অনুকরণে বাড়তে লাগল। শুভঙ্কর বুঝল, তার ধোঁয়াটে মনে সে যা চাইছে, চিন্তাটা তারই একটা রূপ। এবং আরব্য উপন্যাসে যা ঘটেছে, এক্ষেত্রেও তা না ঘটে পারে না।

বৃথা কালক্ষেপ না করে শুভঙ্কর পাইপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে টেলিফোন গার্লকে চৌধুরী কাস্‌ল-এর নম্বর ধরতে বলল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চৌধুরী কাস্‌ল-এর সাড়া পাওয়া গেল। বিক্রম শা-ই টেলিফোন ধরেছেন।

শুভঙ্কর বলল, "আপনাকে বিরক্ত করলাম। কী করছিলেন?"

বিক্রম শা বললেন, "নিরর্থককর কাজে। যা না করলেও সৃষ্টি অচল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবে সে সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম। নিতান্ত লৌকিক উপায়ে। অর্থাৎ চৌধুরী কাস্‌ল্-এর সুরভিত ঢাকা চা পান করছিলাম।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "আমার পাইপ সম্বন্ধে আমার এ রকম একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আজ সে বিশ্বাসে একটা ছোটো খাটো ফাটল দেখা দিয়েছে।"

বিক্রম শা বললেন, "আপনার পাইপ-এর উচিত কাস্‌ল্-এর চা-র সাকরেদি করা।"

শুভঙ্কর বলল, "নিজের স্বার্থে কারো সাকরেদি করতে আমার আপত্তি নেই। বিশেষ করে আপনার।"

বিক্রম শা বললেন, "টেলিফোনে জিভ কেটে বিনয়ের বহর দেখানো যায় না। আমার জবাবটা কল্পনা করে নিন।"

শুভঙ্কর বলল, "বিশেষ একটা ব্যাপারে আপনার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। যদি উৎপাত মনে না করেন কথা বলতে চাই।"

বিক্রম শা বললেন, "যদি এখনই চলে আসেন কথা হতে পারে। চা-ও তৈরী থাকবে।"

শুভঙ্কর রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "ধন্যবাদ।"

বিক্রম শা তৈরী হয়েই ছিলেন। শুভঙ্কর ঘরে ঢুকতেই উঠে নিজহাতে কপাট বন্ধ করে দিয়ে টেবিলে ফিরে এসে বললেন. "কী ব্যাপার! পর্বত মহম্মদের কাছে না গিয়ে মহম্মদই পর্বতের কাছে এলেন!"

শুভঙ্কর একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর অতিথি হিসেবে আমার নিজেকে অনুগৃহীত বোধ কবা উচিত। এখানকার কোনো নিয়ম ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাবার আমার অধিকার নেই, ইচ্ছাও নেই। তবু, অতিথি হিসেবে আমারও দু চারটি প্রশ্ন থাকতে পারে।"

বিক্রম শা মাথা হেলিয়ে বললেন, "সেটা খুবই স্বাভাবিক।"

শুভঙ্কর বলল, "প্রশ্ন স্বাভাবিক হলে উত্তর পাওয়াটাও স্বাভাবিক।"

বিক্রম শা হেসে বললেন, "উত্তর থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু পাবার পথে অস্বাভাবিক বাধা থাকতে পারে।"

শুভঙ্কর সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে বিক্রম শাকে দেখতে দেখতে বলল, "যেমন?"

বিক্রম শা এবারও হেসে দিলেন, বললেন, "প্রশ্ন জানতে পারলে বলতে পারি।"

শুভঙ্কর টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, "আপনি স্বচ্ছন্দে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবেন। দু' কান হতে পারবে না। যদি উত্তব আমার মনোমত না হয়, অতিথি হিসেবে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো আপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, আমি কাস্‌ল্‌-এর কাছ থেকে কোনো কৈফিয়ৎ তলব না করে বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রস্থান করব। আমার দ্বারা কাস্‌ল্‌-এর মর্যাদা বা শান্তি ক্ষুণ্ণ হবে না।"

বিক্রম শা বিচলিত হয়ে বললেন, "এ রকম পরিস্থিতি আমি কল্পনা

করতে পারি না। যা হোক, কোন্ প্রশ্ন আপনাকে দ্বিধায় ফেলেছে জানবার জন্য আমারও কৌতূহলের অন্ত নেই। বলুন।"

শুভঙ্কর বলল, "কাস্‌লয়ের অধীশ্বরী অদৃশ্য মহারানী তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী অলোকসামান্যা অলকা চৌধুরী ও রেশমীজালের মুখাবরণের আড়ালের তরুণী, এই তিনটি ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের প্রাণী। প্রকৃতি বিচারে এদের পারস্পরিক অমিলের চেয়ে বড় অমিল কল্পনা করতে পারি না।"

বিক্রম শা বললেন, "ঠিক! তবে আপাতদৃষ্টিতে বলছেন কেন?"

শুভঙ্কর বলল, "এ জন্যে যে এই ঘোর অমিলের আড়ালে কোথাও একটা আশ্চর্য মিল আছে।"

বিক্রম শা কোনো কথা বললেন না।

শুভঙ্কর বলল, "আমি যে মিলের কথা বলছি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো চলে না। অন্তরালের অদৃশ্য মিল। হঠাৎ মন এই মিলে সাড়া দেয়। এই হচ্ছে একমাত্র প্রমাণ।"

কপাটে মৃদু আঘাত হতে বিক্রম শা উঠে গিয়ে আস্তে কপাট খুলে ধরলেন। চায়ের ট্রেটা নিজেই টেবিলে রাখলেন। কপাট আবার বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন।

দু' কাপ চা ঢেলে দুধ চিনি পরিমাণ মতো মিশিয়ে একটা কাপ শুভঙ্করের সামনে রেখে বললেন, "মনে হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কথা বলছেন। বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারছি না, অথচ মন দু'কান খাড়া করে আছে।" তারপর শুভঙ্করের চোখ এড়িয়ে চা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "আপনার কথার অর্থ কী?"

শুভঙ্কর চায়ের কাপটা ডান হাতে তুলে নিয়ে ঈষৎ হেসে বলল, "আপনিই বলুন।"

বিক্রম শা হতবুদ্ধির মতো শুভঙ্করের দিকে তাকালেন। বললেন, "আমি?"

শুভঙ্কর বলল, "যে তিন ব্যক্তির কথা হচ্ছে, তাঁরা ছাড়া আর কেউ যদি বলতে পারেন তো আপনি।"

বিক্রম শা বললেন, "আপনি ভুল করছেন। আপনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এ রকম কোনো মিলের কথা বলছেন। আমি চাকুরী জীবনে মহাবানীর, ব্যক্তিগত জীবনে ইন্দ্রিয়ের দাস। আমি কী করে ইন্দ্রিয়াতীত মিলের গূঢ় রহস্য বুঝব?"

শুভঙ্কর বলল, "অন্তত কোনো এক কারণে তিনজন রহস্যের গিঠে একসঙ্গে বাঁধা এরকম একটা চিন্তা কখনো মনে এসেছে?"

বিক্রম শা আর কাপ চা নিঃশেষ করে পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, "বিলক্ষণ! কখনো কখনো কেন, সবদাই মনে এসেছে।"

শুভঙ্কর বলল, "একটু খুলে বলবেন।"

বিক্রম শার চোখের পাতা বারবার পড়ল। বললেন, "এই কাস্‌ল্-এর কথাই ধরুন না কেন। আমি, আপনি, লোকলস্কর সবাই তো বাইরের লোক। ভিতরের, অর্থাৎ অন্দরমহলের লোক তো ওরা তিনটি। আর কাউকে কখনোই তো দেখি না।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি তো দেখতে পাই।"

বিক্রম শা সম্মুখে ঝুঁকে বসে বললেন, "পান?"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যা!"

বিক্রম শা বললেন, "আমি দেখি না, আপনি দেখেন। রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার।"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যা! তবে এ যে সে ভূত নয়!"

বিক্রম শার দৃষ্টিতে কতটা ভয় কতটা কৌতূহল প্রকাশ পেল বোঝা গেল না। বললেন, "বলেন কি?"

শুভঙ্কর বলল, "ভূত এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত।"

বিক্রম শা এবার ঘোর অবিশ্বাসে হাসলেন। শুভঙ্কর বলল, "এই ভূত অর্থাৎ রহস্যবন্ধনের চতুর্থ গিঠ আপনি। চৌধুরী কাস্‌ল্-এর সবজ্ঞ ম্যানেজার বিক্রম শা।"

চায়ের কাপটা তুলে মুখে ধরতে বিক্রম শার হাত কাঁপল। কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "এ আপনি আমার উপর অবিচার করছেন মিস্টার ঘোষ। আপনার মতো আমিও কয়েকটা বছর একটা প্রশ্নের জবাবের জন্য অন্ধকারে হাতড়ে মরছি।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "কী প্রশ্ন?"

বিক্রম শা জবাব দিলেন না। হাসলেন।

শুভঙ্কর বলল, "আমার প্রশ্ন একটা নয়। কয়েকটা। আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি। একটি প্রশ্ন বেছে নিতে পেরেছেন।"

বিক্রম শার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক হল। তাঁর মুখে তখনো সেই অবিশ্লেষ্য হাসি।

শুভঙ্কর কী ভেবে কোটের একটা পকেটে হাত রাখতে গিয়ে চমকে উঠল। পকেট থেকে হাত বার করে এনে আলোয় মেলে ধরল। সকালে মৌনী তরুণীর লেখা কাগজের টুকরো। বিক্রম শার সম্মুখে রেখে বলল, "দেখুন চিনতে পারেন কি না।"

বিক্রম শা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় পেলেন?"

বিক্রম শাকে লক্ষ্য করতে করতে শুভঙ্কর বলল, "আমার বিছানার উপর। ভেবেছিলাম জিজ্ঞাসা করবেন, কার লেখা, কাকে লেখা।"

বিক্রম শা বিবর্ণমুখে বললেন, "ধরুন জিজ্ঞাসা করছি।"

শুভঙ্কর বলল, "আপাতত অতিথিমহলে যিনি আমার অভিভাবিকা তাঁর। লিখেছেন আমাকে।"

বিক্রম শার মুখে ঘোর অবিশ্বাস ফুটে উঠল। তিনি কঠিন সঙ্কটে যেন আশ্বাসের জন্য শুভঙ্করের দিকে সকাতর দৃষ্টিতে তাকালেন। আশ্বাস পেলেন না। বিক্রম শা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মহারানীর হস্তাক্ষর তাঁর অচেনা নয়। তাহলে মৌনী তরুণী তাঁর আকাশকুসুম কল্পনা? মহারানী তমিস্রার মর্মান্তিক পরিহাস কিম্বা কূট কৌশল? যার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ নেই, সেই মৌনী তরুণীকে অবলম্বন করে তাঁর ভিতর একটা অন্তরঙ্গ জগত গড়ে উঠেছিল। ভেবেছিলেন

পৌরুষের পরাক্রমে কিম্বা অদৃষ্টের দাক্ষিণ্যে এই মৌনী তরুণী একদিন তাঁর জীবনে বাস্তব ও মুখর হয়ে উঠবে। এই জগতের কপাট একদিন খুলবে এই আশায় তিনি অতিথিমহলের রহস্যকে সম্মুখে রেখে প্রতীক্ষায় ছিলেন। একটুকরো কাগজের ধাক্কায় সেই জগতটা আজ চক্ষের পলকে ধ্বসে পড়ল।

মাঝরাতে অলকা চৌধুরী প্রশস্ত রাজপথে একটা গাছের ধারে তার দুর্মূল্য সৌখীন টু-সিটারটা বেঁধে রেখে যমুনার পারে ঢালু জমি বেয়ে নেমে এল। বুকের এক পাশে বডিসের তলা থেকে সিল্কের রুমালটা বার করে এনে একটা বড় পাথরে পেতে নিয়ে বসল। কখন সে ডান হাতে গাল রেখেছে, সেই অবস্থায় তার জীবনের এক গভীর চিন্তার অসংখ্য ধাপ বেয়ে একটা নূতন সমস্যার দশমুখী কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছে তার খেয়াল ছিল না। কৃষ্ণপক্ষ রাতের যমুনার প্রায় অদৃশ্য জলপ্রবাহ থেকে অঘ্রানের শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীরে কাঁপুনি ধরল। আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে উদাসী দৃষ্টিতে সম্মুখে তাকালো। যমুনাব বুকে রাতের অন্ধকার তার দুচোখে নবম প্রলেপ বুলিয়ে দিল। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবল এই নরম অন্ধকার যদি সে বুকের ভিতর কিছুক্ষণের জন্য পেত, ধরে রাখতে পারত, দ্বন্দ্ব-দগ্ধ ভিতরটা কিছুটা জুড়োত।

সে যখন সবে কিশোবী তখনই সে অভিসারের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ডাকের পর ডাক এসে তাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল। প্রথম সে বিশেষ চঞ্চল ও অস্থির বোধ করত। সে দেখতে পাচ্ছে না এ রকম একটা দেয়ালের একধারে সে, অন্যধারে অভিসারের লক্ষ্য। একবার দেয়ালটা দেখতে পেলে ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে। ভাঙতে না পারলেও সেই চেষ্টায় যদি তার দু' হাত আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়, তাহলেও রক্তক্ষয়ের ক্লেশের ভিতর দিয়েই অভিসারের আনন্দের আস্বাদ পেতে পারে। এইরকম একটা চিন্তা তার মনে

সময়ে অসময়ে হানা দিত। আক্রমণ যখন চরমে উঠত, এই চিন্তা নিদ্রায় সুখ-স্বপ্নের ছদ্মবেশে এসে দুঃস্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করত।

বিহ্বলতার যুগটা কয়েক বছরেই শেষ হয়ে তাকে বুদ্ধি, বিচার ও অভিজ্ঞতার পথে ধ্যানের যুগে নিয়ে এসেছিল। অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার, কারণ তার জন্য তাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। সে তার জীবনের চারদিকে তাকিয়ে কতগুলো সোজা চওড়া পথ দেখতে পেয়েছিল। আলোকিত জনবহুল পথ। এই জনতার ভিড়ে যে কটা মুখ সে দেখেছিল, তা তাকে ভুল নিশানা, ভুল সংবাদ দিয়েছিল। আসলে ঐ মুখগুলো স্বাভাবিক মুখ নয়, মুখোশ মাত্র। তাদের নিশানা অনুসরণ করে সে একাধিকবার ঠকেছিল। তার ভিতরের ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়েছিলেন। পূত হবার জন্য শুচিস্নানের উৎস সে নিজের ভিতরই খুঁজে পেয়েছিল। না হলে সে আত্মগ্লানিতেই মরে যেত।

ধ্যানের যুগ কয়েক বছর আগে সুরু হয়ে এখনও চলছে। কিন্তু এ ধ্যান পাহাড়চূড়োয়, গিরিগুহায়, নিভৃত অরণ্যে কিম্বা সতর্ক পাহারায় দেবমন্দিরে প্রাচীন যুগের কাব্যবন্দিত ধ্যান নয়। এ ধ্যান আধুনিক জীবনের ছদ্মবেশে আধুনিক অস্থির স্বল্পায়ুঅর্থ জীবনকে এড়িয়ে যাওয়ার নিগূঢ় ধ্যান। এ ধ্যান শুধু আত্মারতি নয়, সেই সঙ্গে অসাধ্যসাধনের দুরূহ প্রয়াস। জীবনের নানা ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যিকারের ডাক চিনে নেবার ক্লান্তিকর চেষ্টা। এ ধ্যানে রত হবার পর সে তার জীবনের আকাশের আলো দিনেরাতে কখনো নিভতে দেয়নি। কিন্তু কোন্ রূপ তার প্রার্থিতের রূপ বুঝবার চেষ্টায় তিন তিনবার সে ব্যর্থ হয়েছিল। মানুষের ভিতর সে তার হৃদয়ের পদ্মনাভ দেবতাকে পেতে চেয়েছিল। তিন তিনবার তাঁর রথের ধ্বজা তার জীবনের দিগন্তে দেখেছিল। তিন তিনবার সে নারীর দুর্জয় অভিমান বিসর্জন দিয়ে ঐ রথের সম্মুখে পথের ধূলোয় মিশে গিয়ে রথ থামিয়েছিল। প্রতিবারই সারথী তার দিকে পাষাণ বিগ্রহের শূন্যদৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়েছিল। প্রতিবারই তার অভিসার

নাটকের শেষ অঙ্কে, জীবনের দীর্ঘতম দীর্ঘশ্বাসের আবহসঙ্গীতে সাড়া দিয়ে, অনন্ত অন্ধকারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যবনিকা নেমে এসেছিল। কিন্তু লগ্নতিথির বিচার না করেই প্রতিবারই নির্বাণের মুহূর্তে তার হৃদয় জ্বলে উঠেছিল। বাঁশী বেজেছিল। কপাট খুলে গিয়েছিল। অভিসারের ডাক শুনে সে আবার শয্যায় উঠে বসেছিল।

মহারানীর আমন্ত্রণে তিনটি অসাধারণ পুরুষ চৌধুরী কাস্‌ল-এর অতিথিশালায় যথাক্রমে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একজন ছিলেন বিদেশী কবি। স্বদেশে ঘর খুঁজে না পেয়ে জীবনস্রোতে ভাসমান অবস্থায় একদিন নিউ দিল্লীতে এসে ডাঙা খুঁজে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় অতিথি ছিলেন জ্ঞানলিপ্সার একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। তিনি এসে-ছিলেন লঙ্কাদ্বীপ থেকে। ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্ত প্রতিবাদ। চঞ্চল, সদাচলমান, বাঙ্মুখর। লম্পটের লালসার চেয়েও জ্ঞানোন্মত্ত মানুষের তথ্যালোলুপতা কত মারাত্মক হতে পারে, অতিথিশালায় তার কয়েক বছরের কাহিনী তার অকাট্য প্রমাণ। মনুষ্য জীবন তাঁর কাছে ছিল কোটি সূক্ষ্ম অঙ্গবিশিষ্ট এক অতিকায় কীট। আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য, কিন্তু কীটের স্বগোত্র। তৃতীয় অতিথি ছিলেন এক অবজ্ঞাত মহাপণ্ডিত। তাঁর ব্যক্তিগত বিয়োগান্ত অধ্যায়ের জন্য অবশ্য পৃথিবীকে দোষ দেওয়া চলে না। কবে কী কারণে তাঁর অভিমানে আঘাত লেগেছিল তা পৃথিবী কেন হয়তো তিনি নিজেও সঠিক বলতে পারতেন না। কিন্তু সারাজীবন ঐ আঘাত তিনি আঁকড়ে পড়ে ছিলেন। কোন কারণে কুবেরের ভাণ্ডারের চেয়েও ঐ আঘাতের মূল্য ছিল তাঁর কাছে বেশী। তিনি অহর্নিশ সাধনায় ঐ আঘাতকে বেদনার রসায়নে মিশরের মমীর মতো টিকিয়ে রেখেছিলেন। এক অন্তর্মুখী জীবন তাঁকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছিল। জীবনের শেষাংশে তিনি সম্পূর্ণ মৌনী হয়ে পড়েছিলেন। অদৃশ্য মহারানীর রহস্যের ভিতর তিনি যেন বিলীন হবার সহজ পথ খুঁজে পেলেন। একদিন রসনার কথার মতো তাঁর হৃৎপিণ্ডের উচ্চারণও থেমে গেল।

এই তিনটি অতিথির কারো চোখেই অলকা চৌধুরী তার প্রার্থিত সঙ্কেত দেখতে পায়নি। তার বিশেষ ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের তিনজনের চোখেই সে দেখেছিল সুগভীর নিস্পৃহা। সে বুঝেছিল এঁদের কারো জীবনই প্রশ্নে শুরু হয় নি। সুরু হয়েছে উত্তরে। এঁরা সকলেই অর্ধনাটকের নায়ক। উত্তরে সুরু হয়ে উত্তরেই শেষ। এ সিদ্ধান্ত শুধু তার একার নয়, গোটা চৌধুরী কাসল এর। তার, মহারানীর ও অতিথিশালার মৌনী তরুণীর। মহারানীর ও অতিথিশালার তরুণীর কথা মনে হতে তার মুখ এক ম্লান হাসিতে করুণ হয়ে ওঠে। তারা তিনজন চৌধুরী কাসল-এর তিনটি মুখ। চৌধুরী কাসল থেকে জীবনের তিনদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রয়েছে। কিন্তু তারা যে পরস্পরের কত কাছে, একটি হৃৎপিণ্ডের তিনটি ধ্বনি, তা তাদের সুগোপন স্বার্থে চতুর্থ ব্যক্তিকে বলা চলে না। অথচ তাদের প্রত্যেকের নিবিড় প্রয়োজনে তারা যে পরস্পর থেকে কতদূরে, ভিন্ন গ্রহে ভিন্ন অভিযাত্রীর মতো, তাও কি বলা চলে? এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিণতি কী হতে পারে ভেবে অলকা চৌধুরী চৌধুরী কাসল্-এর শেষ অতিথির মতো কখনো কখনো নির্বাণের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে পড়ত।

চতুর্থ অতিথি শুভঙ্কর ঘোষ চৌধুরী কাসল্-এর জীবনে একটা নতুন চমক দিয়ে আবির্ভূত হল। মহারানী লোকচক্ষুর অন্তরালে, অতিথিশালার তরুণী তার আপাততুচ্ছ জীবনযাত্রায়, অলকা চৌধুরী সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এক নতন প্রত্যাশায় হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো। কেন? এই প্রশ্নটা যেন উত্তরের চেয়েও বেশী আশ্বাস দিল। শুভঙ্কর ঘোষ সুশিক্ষিত তরুণ। কিন্তু অসাধারণত্বের কোনো লক্ষণই তার চরিত্রে বা আচরণে প্রকট নয়। সে কী, তার চেয়ে ঢের বেশী সে কী হতে পারে এই চিন্তাই চৌধুরী কাসল্-এর মন আলোড়িত করল। বহু বছরের স্তূপীকৃত ছাইয়ের তলায় এতদিন পর চৌধুরী কাসল্ এক নূতন স্ফুলিঙ্গের সন্ধান পেল।

চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর অতিথিমহলের পালাবদলের মূলে ছিলেন মহারানী। মহারানীর ছুটি শাখা যেন অলকা চৌধুরী ও মৌনী তরুণী। কিন্তু এই ছুটি শাখায় কী ফল ফলবে, তাতে লাভ ক্ষতি কী, এ বিষয়ে মহারানী ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। আসল পালার পাশে একটি ছুটি কেন, আরো বেশী পালার মহলা চলতে পারে। কিন্তু উপসংহারের পূর্বেই তাদের কোথাও থেমে যেতে হবে। আকাশে উড়ুক কি ধুলোয় লোটাক, শুধু একটি নিশানই দেখা যাবে। সে নিশান মহারানীর। অতিথিমহলের তরুণী তো বটেই, অলকা চৌধুরীও এই রকম একটা সর্ত মেনে নিয়েছিল। পদ্মনাভ দেবতার প্রতীক্ষার দীর্ঘ প্রহরে ও ব্যর্থতার তীব্র খণ্ডমুহূর্তেও এই সর্ত ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু শুভঙ্কর ঘোষ আসার পর একটা তুমুল ওলটপালটের সম্ভাবনা তার মনে ঝড়ের আকাশে বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে চমকাতে লাগল। সে বুঝতে পারল এই প্রথম সে নিশান তুলতে যাচ্ছে মহারানীর নিশানের পাশে, তলায় নয়। সে মহারানীর প্রতিদ্বন্দ্বী এ কথা ভেবে তার রোমাঞ্চ হল। মহারানীর সঙ্গে সে যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ! ফলে, জেতার মুহূর্তে কি হঠাৎ চূড়ান্ত রকমে হেরে যাবে? পরিণাম সম্বন্ধে সে একটা নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে। সেই সঙ্গে একটা চাপা অহঙ্কার ও উল্লাস।

প্রায় আধখানা রাত যমুনার পারে কেটে গিয়েছে তার খেয়াল ছিল না। ভোরের দিকে বাতাসে ও শেষরাতের ক্ষীণ আলোয় একটা নতুন সুর বাজতে লাগল। অলকা চৌধুরীর ধ্যানভঙ্গ হল। সে তার টু-সিটারের দিকে অগ্রসর হল।

ছুটো দিন শুভঙ্কর চৌধুরী কাস্‌ল্‌কে একপাশে সরিয়ে রেখে অফিস অবলম্বন করে বাঁচতে চেষ্টা করল। সে যে শুধু সফল হল তা নয়, অফিসের কাজ অসম্ভব রকম এগিয়ে দিল। বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। প্রথম রাতের পর মহারানী আর তাকে ডাকেন নি,

অলকা চৌধুরীও প্রথম সাক্ষাতের পর তার কাছ থেকে কোনো সংবাদ না পেয়ে টেলিফোন কিম্বা পত্র মারফৎ অধীর হবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেনি। এমন কি অতিথি মহলের তরুণীও গোড়ায় চাঞ্চল্যের আভাস দিয়ে হঠাৎ নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বিক্রম শাকে সে কী করে কেন নাড়া দিয়েছে এ প্রশ্নও যেন তার কাছে অবাস্তর। বিষয়টা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে শুভঙ্কর নিজের সম্বন্ধে একটা গূঢ় সত্য আবিষ্কার করে বিস্মিত হল। এই প্রথম সে নিজের চরিত্রে একটা বিশেষ লক্ষণ দেখতে পেল। একটা বিশেষ মনোবৃত্তি। এ মনোবৃত্তি যে আসলে দম্ভ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তার চিন্তায় এই দম্ভ সুগোপনে সাড়া দিয়ে চলল। ফলে, সে বারবার একই সিদ্ধান্তে পৌছল—তাকে বাদ দিয়ে চৌধুরী কাস্‌ল্ নেই। সুতরাং চৌধুরী কাস্‌ল্-এর এই সাময়িক ঔদাসীন্য একটা সাজানো ব্যাপার। নির্বিষ সাপের শঙ্খচূড় খোলস।

তবু, এই দম্ভের দুর্গে বাস করেও দিবাস্বপ্ন দেখা চলে। শুভঙ্কর স্বপ্নের নানা বিচিত্র বিন্যাসে চৌধুরী কাস্‌ল এর একাধিক ভাষ্য পড়ল। "সোহম"য়ের মতো সব ভাষ্যেই অদৃশ্য মহারানী সব কিছু আড়াল করে দাঁড়ান। অতিথি মহলের তরুণী কোন্ ছার! স্বয়ং অলকা চৌধুরী, যে তরুণী হরিণী তার মনকে দূর অরণ্যের স্বপ্নে টেনে নিতে চায়, সেও যেন চোখে পড়েও পড়ে না। যাকে কখনো দেখেনি, তার কল্পনা সেই মহারানীকে আশ্রয় করে একটা অলৌকিক শক্তিতে বেড়ে ওঠে।

শুভঙ্কর ঘরেই ডিনার খাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। এই সময়ে মহারানীর কাছ থেকে আহ্বান এল। খবর নিয়ে এল মৌনী তরুণী। শুভঙ্কর একটা অনুমান করল। তা যে সত্য, হাতে নাতে প্রমাণ পেল। দেখল তরুণীর মুখে প্রথম রাতের সেই অর্থপূর্ণ হাসি। বুঝল কাস্‌ল্ তার নাটকের আর একটা দৃশ্যের জন্য তৈরী। পট উঠল বলে।

জাফরীর আড়াল থেকে মহারানী বললেন, "তিনটে দিন অসম্ভব ব্যস্ততার ভিতর কেটেছে। প্রতিদিনই ভেবেছি একবার ডাকি। শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। অথচ প্রতিমুহূর্তেই আপনার কথা মনে হয়েছে।"

প্রতিমুহূর্তেই! শুভঙ্কর রুদ্ধশ্বাসে মহারানীর দ্বিতীয় উক্তির অপেক্ষায় রইল।

মহারানী বললেন, "আমি কী নিয়ে কী রকমে ব্যস্ত, বুঝিয়ে বলা কঠিন। শুনে হয়তো হাসছেন, একটা মানুষ একা একা ব্যস্ত হয় কী করে? আপনাকে বুঝিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়। আর কেউ হলে বোঝানো দূরের কথা, উল্লেখ পর্যন্ত করতাম না।"

আর কেউ হলে? বিস্ময় ও কৌতূহল পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে।

মহারানী বললেন, "অথচ একা মানুষ সত্যিই কত ব্যস্ত। কত ক্লান্ত! কেন জানেন?"

শুভঙ্কর মুখ তুলে জাফরীর দিকে তাকালো। মহারানী বললেন, "একা মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় না। খুঁজে পেলে সে আর একা নয়। নিজেই নিজেকে সঙ্গ দেয়। এই সঙ্গ ছাড়া মানুষের চলতে পারে না। সে নুড়ির খোঁজে অন্ধের মতো নিজের খোঁজে বিশ্বসংসার হাতড়ে বেড়ায়।" জাফরীর আড়ালে হৃদয়ের স্পন্দন শোনা না গেলেও শুভঙ্করের অনুভব করতে বাধা থাকে না।

শুভঙ্কর বলল, "এই হাতড়ে বেড়ানোই তো সাধনা।"

মহারানী ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, "না। এ হচ্ছে দুয়ারে দুয়ারে মাথা কোটা।"

শুভঙ্কর বলল, "মাথা কুটে মরাও তো সাধনা।"

মহারানী বললেন, "মাথা কুটে রক্তমাখা হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে একদিন সাধনার সিঁড়ির নিচেয় হয়তো পৌঁছানো যায়। কিন্তু মাথা কুটে মরা সাধনা নয়।"

শুভঙ্কর নীরবে মহারানীর কথার প্রতীক্ষায় রইল। কিন্তু মনে হল, মহারানী থেমে গেলেন। জাফরীর আড়ালের স্তব্ধতা জমে গিয়ে নিরেট পাষাণের মতো তার মনের উপর চেপে বসল। সেও যদি একটা কথা বলে এই স্তব্ধতা চূর্ণ করে দিতে পারত! অবশেষে মহারানী কথা বললেন। মনে হল খুব দূরের কথা খুব নিকটে বলছেন।

মহারানী বললেন, "সাধনার সুরু, ধ্যানের সুরু আলোর সুরুর মতো। দপ করে আগুন জ্বলে ওঠার মতো। আকাশে চন্দ্র সূর্যের প্রকাশের মতো। কিন্তু তার জন্য নিজের খোঁজ পাওয়া দরকার। খোঁজের নামে আমরা কপাট খুলে বার হয়ে পড়ি। কপাট বন্ধ করে ভিতরের চেয়েও ভিতরে ঢুকবার কথা ভুলে যাই। আলোর সত্যিকারের রূপ দেখতে গেলে চোখ বুজতে হয়। আলোয় আলো-কে যতটা দেখি, অন্ধকারের পটে দেখি তার চেয়ে কত বেশী। কত স্পষ্ট।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু কপাট তো শুধু বন্ধ করবার জন্য নয়, খুলবার জন্যও। না হলে কপাটে দেয়ালে তফাৎ কী? তা ছাড়া কাজ কী সাধনা নয়? হৈ-চৈয়ের পৃথিবীর ছোট বড় অসংখ্য কাজ?"

মহারানী বললেন, "আপনার যুক্তি শুনে আনন্দ হয়। কাগজ কেটে কেটে আমার মনের তলোয়ারের ধার যেতে বসেছে। আজ সত্যিকারের কোপ দেবার সুযোগ পেলাম।" কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "গোড়ায় কপাট খুলে ফেললে ভিতর ও বার একাকার হয়ে যেতে পারে। কী যে কী, তা বুঝবার ও চিনবার পথে একাধিক সংশয় বাধা হতে পারে। তাই, জীবনের গোড়ায়, প্রথম ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কপাট বন্ধ করে একবার ভিতরটা দেখে নেওয়া দরকার। কাজ তখনই সাধনা, যখন সাধনায় কাজ শুরু হয়।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার তো ধারণা আগে কাজ, পরে সাধনা। কাজের স্রোত যখন তীব্র হয়ে আসে, নানা স্রোত পাক খেয়ে একটা

আবর্তের সৃষ্টি হয়, তার ভিতর থেকে সাধনার প্রচণ্ড টান মনকে জানান দিয়ে যায়।"

মহারানী হাসলেন। বললেন, "আমি এ কাজের কথা বলছি না। বেঁচে থাকাই একটা কাজ। এই কাজটা বড় করতে গিয়ে, বাড়াতে গিয়ে আরো অনেক কাজ। কপাটের বাইরে যে সমুদ্র সফেন হয়ে ওঠে, সেই সমুদ্রে পাড়ি জমানোর কাজ। মানুষের ভিড়ে রূপ ও ধ্বনির, গন্ধ ও স্পর্শের আদি অন্তহীন নাটকে যোগ দেবার কাজ। এ কাজ ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।"

শুভঙ্কর ভাবল মহারানী কি তার যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে মেনে নিচ্ছেন ?

পরমুহূর্তে মহারানী বললেন, "এই কাজের জন্য যে-মানুষটা, অর্থাৎ মানুষের যে অংশ কপাটের বাইরে থাকে, তার জন্য আমি ভাবি না। সে কোনো একদিন জন্ম নেয়, কোনো একদিন মরে। কিন্তু যে-মানুষটা মরে না, মানুষের যে-অংশ আগুনে পোড়ে না, জন্ম-মৃত্যুর নাগালের বাইরে, তাকে নিয়েই আমার যত চিন্তা। প্রকৃতির আইনের বাইরে তার একটা জগৎ আছে। সেখানে তার আসল কাজ। এই কাজের ভিতর দিয়ে সে নিজেকে, অর্থাৎ তার ভিতরের যে-মানুষটি কখনো মরে না, তাকে বুঝতে চায়, জানতে চায়। তার চেয়েও ঢের বেশী চায় তার সঙ্গ।"

শুভঙ্কর বলল, "বুঝেছি।"

মহারানী উষ্ণস্বরে বললেন, "না। বোঝেন নি। বুঝলে আপনার কথা বলার স্পৃহা থাকত না। কারণ সব কথার অর্থ ফুরিয়ে যেত।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু আপনি কথা বলছেন।"

মহারানী হেসে বললেন, "কারণ আমিও বুঝিনি। তবু আপনার ও আমার ভিতর একটা পার্থক্য আছে। আপনি বুঝবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কোনো চেষ্টাই করেন নি। তাই বোঝেননি।

আমি গভীর প্রয়োজনে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বোধের অভাবে বুঝিনি। আমি তবু খেলার ভিতর আছি। আপনি নেই। আমার ও আপনার ভিতর এই হচ্ছে আসল পার্থক্য।"

শুভঙ্কর বিষয়টা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। বলল, "মোটের উপর আমারই লাভ। যে কারণেই হোক, পৃথক যাত্রায় আমরা এক ফল পাচ্ছি। আপনিও বোঝেন নি। আমিও বুঝিনি। চেষ্টা না করেই বুঝিনি।"

মহারানী বললেন, "কিন্তু ঐ চেষ্টার আনন্দ যে কী তা কি করে আপনাকে বোঝাবো। চেষ্টা যখন নিবিড় হতে হতে ধ্যানের আসনে বসে, জীবনের সব সুখ দুঃখ তুচ্ছ মনে হয়। ধ্যানের সুর বেজে উঠতেই নিজেকে খুঁজে পাই। সঙ্গপিপাসা মেটে। পরম-তৃপ্তিতে ভিতরটা ভরে ওঠে।"

শুভঙ্কর বলল, "তাহলে তো আপনি বুঝেছেন! বোঝেন নি বলেন কেন?"

মহারানী শান্তকণ্ঠে বললেন, "নিজেকে খুঁজে পাওয়া আর তাকে বুঝে উপলব্ধির অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া এক কথা নয়। নিজেকে খুঁজে পাই। কিন্তু অন্ধকারের যে আলোয় তাকে দেখা যায়, সে আলো আমার ভিতরে জোনাকীর মতো জ্বলে। ফলে তাকে পুরোপুরি দেখে স্পষ্ট চিনে নেওয়া আর হয় না।"

শুভঙ্কর বুঝবার চেষ্টা করল। কতটা বুঝল বিচার করার চেষ্টা না করে কাছাকাছি একটা সূত্র ধরে বলল, "আপনি অত্যন্ত একা।"

মহারানী বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ। বড় একা। কত চেষ্টায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কখনো সখনো নিজেকে খুঁজে পাই। তাই আর কারো ভিতর নিজেকে দেখার, পাবার ইচ্ছা হয়। এ রকম কাউকে পাই তো একবার তার ভিতর নিজেকে দেখি। সম্ভব হলে তাকে কাছে ধরে রাখি। বারবার তার ভিতর ঢুকে গিয়ে নিজেকে দেখে তার সঙ্গে এক হয়ে যাই।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনি মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে পাবার কথা বলছেন ?"

মহারানী বললেন, "ঠিক তা নয়। ওটা মামুলী কথা। ঈশ্বর সকলের নিজের। একজনের ঈশ্বর আরেকজনের নয়। আমি কারো ভিতর নিজেকে অর্থাৎ নিজের ঈশ্বরকে দেখতে চাই।"

শুভঙ্কর মহারানীর কথার কোনো জবাব দিল না।

মহারানী বললেন, "কয়েকটা বছর এই মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তিন তিনবার মনে হল পেলাম। তিন তিনবারই ঠকলাম।" একটু থেমে মহারানী বললেন, "কিন্তু হাল ছাড়িনি। নতুন করে চেষ্টা সুরু করেছি।"

অতিথিমহলের তিনটি অতিথির সঙ্গে মহারানীর মনের মানুষ সন্ধানের কি কোনো সম্পর্ক আছে ? শুভঙ্করের মনে একটা সন্দেহ ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে।

মহারানী হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, "আসল কথাটাই এতক্ষণ বলা হয় নি। অলকার সঙ্গে দেখা করেছিলেন ? কি রকম লাগল ?"

শুভঙ্কর বলল, "আপনার বোনকে ভালো না লাগার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

মহারানী বললেন, "ওর সঙ্গে পরিচয়ের পর এক শ্রেণীর পুরুষের পক্ষে আকৃষ্ট না হওয়া অসম্ভব। আপনি কি মনে করেন ?"

শুভঙ্কর প্রমাদ গণল। হেসে বলল, "মাত্র দু-ঘণ্টার পরিচয়ে মনে যতটা দাগ কাটা সম্ভব, তার চেয়ে বেশী কিছু আপাততঃ লক্ষ্য করছি না।"

মহারানী সখেদে বললেন, "আর আমি তো পাথরের জাফরীর আড়ালে। অদৃশ্য। অন্ধকারের সামিল।"

মহারানী সেদিন সূচনায় 'প্রতিদিন', 'প্রতিমুহূর্তে' ও 'আর কেউ হলে' কথাগুলিতে কি নৈকট্যের কোনো ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন ?

এ বিষয়ে শুভঙ্করের পক্ষে নিশ্চয় করে কিছু ধরে নেওয়া সম্ভব না হলেও মহারানীর শেষ কথার উত্তরে শুভঙ্কর হঠাৎ প্রতিদানের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। বলল, "আপনি অদৃশ্য। সহজবোধ্যও নন। অথচ আপনার কথা আমি প্রতিমুহূর্তেই ভাবতে সুরু করেছি।"

জড় পৃথিবীর বাধা না থাকার ফলে মনে যে ঘটনা ঘটে মন ছুঁয়ে থাকতে পারলে তার খবর পেতে এক মুহূর্তের এক কণাও দেরী হয় না। শুভঙ্কর তৎক্ষণাৎ খবর পেল। বুঝল জাফরীর ওধারে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। এবং সেই ঘটনা তাকে এক বিশেষ অর্থে স্পর্শ করেছে। একটা খেলার খবর সে জানত না। কিন্তু খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুভঙ্কর দেখল সে খেলার বাইরে নেই। তার একটা পা সেই খেলার গণ্ডির ভিতর। আর একটা পা তখনো নিউ দিল্লীর শক্ত মাটিতে। কখনো কখনো অলকা চৌধুরীর বনেদী ক্লাবে।

শুভঙ্কর অতিথি মহলে ফিরে এসে কিছুক্ষণ স্টাডিতে ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইল। পরে টেবিলে চেয়ারটা টেনে বসল। কী ভেবে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল।

অপর প্রান্তে বিক্রম শার গলা শোনা গেল।

শুভঙ্কর বলল, "অসময়ে বিরক্ত করলাম।"

বিক্রম শা বললেন, "বিলক্ষণ! আমি তো বিরক্ত হবার জন্য এই ক'টা দিন হা-হুতাশ করছি।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু এত হা-হুতাশ কেন?"

বিক্রম শা বললেন, "না করাটাই অস্বাভাবিক। মনে রাখবেন আপনি চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর চতুর্থ অতিথি।"

চতুর্থ কথাটার উপর কি বিক্রম শা জোর দিলেন? শুভঙ্কর একটা নতুন চিন্তার সূত্র লক্ষ্য করল। বলল, "সব জেনে শুনেও অতিথিকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছেন। মজা দেখছেন।"

বিক্রম শা কয়েক সেকেণ্ড সময় নিলেন। বললেন, "সব জানলে অন্য সুরে কথা বলতাম। হয়তো মহারানীর মতো আর একটা জাফরীর দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হতাম।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু আমি চতুর্থ অতিথি এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। কেন?"

বিক্রম শা বললেন, "কারণ স্পষ্ট। তিনটি অসাধারণ অতিথির পর আপনি এলেন। অস্বাভাবিক পবিস্থিতিতে জরুরী নিমন্ত্রণ পেয়ে। কেন? যদি বুঝে থাকেন নিশ্চয়ই অস্বীকাব কববেন না আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু এটা আমারই প্রশ্ন। যতটা আপনার তাব চেয়ে অনেক বেশী আমার। কেন জানেন?" একটু থেমে, বিক্রম শাকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে, তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে, শুভঙ্কর বলল, "নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে আমি বিস্ময় প্রকাশ কবতে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাব সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা পোষণ করেন এ রকম কারো কাবো মুখে আমার সুখ্যাতি শুনে মহারানী আমাকে অতিথি হিসেবে পেতে উৎসুক হয়ে পড়েছিলেন। কথাটা আমার অফিসে নিমন্ত্রণ রহস্যের একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে।"

বিক্রম শা বললেন, "সেদিন নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে আপনাকে যে যে কথা বলেছিলাম প্রতিটি অক্ষর মনে আছে। আপনাকে কয়েকটা নাম ও টেলিফোন নম্বরও দিয়ে এসেছিলাম।"

শুভঙ্কর একটু তপ্তস্বরে বলল, "আমি এত নির্বোধ নই যে তাঁদের কাছে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর রহস্য নিয়ে জবাবের আশায় যাবো। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। এ ব্যাপারে নাড়িনক্ষত্র না জানলেও অন্ততঃ এমন কিছু নিশ্চয়ই জানেন যা জানতে পেলে আমি অন্ধকারে কোনো রকমে একটা পথ, যত অস্পষ্টই হোক, দেখতে পাই।"

বিক্রম শা বললেন, "প্রথম দিন এবং তারপরও একাধিকবার

আপনাকে বলেছি আমি হুকুমের চাকর। সেদিন মহারানীর আদেশে আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলাম। শুধু তা নয় আপনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, এরকম একটা ভারও আমার উপর ছিল। না হলে ও নিমন্ত্রণ ডাকে পাঠিয়েই মহারানী ক্ষান্ত হতেন। বড়জোর পিয়নের হাতে চিঠি পাঠাতেন।"

শুভঙ্কর কোনো জবাব দিল না। কিন্তু টেলিফোন ছাড়ল না। বিক্রম শার বুঝতে বাকী রইল না সে নতুন আক্রমণ রচনা করছে।

বিক্রম শা বললেন, "সেদিন মহারানীর অনুগত ভৃত্য হিসেবে আপনাকে নিমন্ত্রণের টোপে গেঁথে তুলেছিলাম। অবস্থা বিবেচনা করে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন।"

শুভঙ্কর গলা নামিয়ে বলল, "মিস্টার শা। চাতুর্যের একটা সীমা থাকা দরকার। আমি দেখছি আপনার ক্ষেত্রে নেই। সত্য গোপন করে আমাকে কাস্‌লয়ে ঢুকিয়ে ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছেন। এখন আমার সম্বন্ধে কৌতূহল, যার আসল অর্থ সন্দেহ, প্রকাশ করছেন।"

বিক্রম শা বললেন, "ভুল করবেন না মিস্টার ঘোষ। সন্দেহ নয়। কোনো ক্রমেই নয়। কৌতূহল। গভীর কৌতূহল।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "কৌতূহলের কারণ?"

বিক্রম শা বললেন, "মহারানী।"

শুভঙ্কর সবিস্ময়ে বলল, "মহারানী?"

বিক্রম শা বললেন, "হ্যাঁ।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "এ কথার অর্থ কী?"

বিক্রম শা বললেন, "আমার বুঝবার কথা নয়। বুঝলে আপনিই বুঝেছেন। না হলে বুঝবেন।"

শুভঙ্কর গভীর বিস্ময়ে বলল, "আমি আপনার কথার একবর্ণও বুঝতে পারছি না।"

বিক্রম শা বললেন, "আমি আপনার এ কথার পর আপনাকে অবিশ্বাস করতে পারি না। আমারই বুঝবার ভুল।" একটু থেমে বললেন, "মহারানী বদলে যাচ্ছেন। বিশেষ রকমে। আকাশে হঠাৎ একটা গ্রহ বা নক্ষত্র তার কক্ষ বা স্থান থেকে বার হবার সময়ে বদলাতে স্বরু করে। এ সেইরকমের একটা আশ্চর্য পরিবর্তন।"

শুভঙ্কর হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করল, "আমি কি মহারানীর শান্তির ব্যাঘাত করেছি?"

বিক্রম শা বললেন, "একেবারে না বললে মিথ্যে বলা হবে। হ্যাঁ। কোনো বিশেষ অর্থে।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "যেমন—?"

বিক্রম শা জবাব দিলেন, "মহারানীর ভিতর কয়েক বছর বাদে জীবন-পিপাসার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। কাস্‌ল-এর কাজে কমে যেন সাড়া দিতে স্বরু করেছেন।"

শুভঙ্কর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার ভাবতে বসল।

অফিসে সকালের দিকের কাজ চুকিয়ে শুভঙ্কর একটা হাই তুলে চেয়ারে আরাম করে বসল। তার হাতঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। এই সময়ে তারস্বরে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

অলকা চৌধুরী বলল, "কী করছেন?"

শুভঙ্কর বলল, "কাজের জাঙ্গাল পার হয়ে একটু দম নিচ্ছি।"

অলকা চৌধুরী বলল, "দম নেবার পর কী করবেন?"

শুভঙ্কর বলল, "একটা পাশবিক কাজ করব।"

টেলিফোনের অপর প্রান্তে অলকা চৌধুরী হেসে উঠল। বলল, "পাশবিক?"

শুভঙ্কর বলল, "রীতিমতো। অর্থাৎ লাঞ্চের ঘণ্টায় আহারের সন্ধানে ক্যান্টিন-এর জঙ্গলে যাবো।"

অলকা চৌধুরী বলল, "বাঁচালেন। আমি ভাবলাম কী কাণ্ড করতে যাচ্ছেন। আমি আপনার এই পাশবিক কাণ্ডে যোগ দিতে পারি ?"

শুভঙ্কর একটু বিব্রত বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, "এখানে ক্যানটিনে আসবেন ?"

অলকা চৌধুরী বলল, "হুকুম পেলে অবশ্য যাবো। তবে তেমন ইচ্ছে নেই। নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ হবে না। তার চেয়ে আপনি আসুন।"

শুভঙ্কব বলল, "কোথায় ?"

অলকা চৌধুরী জবাবে বলল, "কোথায় আবাব ! ক্লাবে। আমি ক্লাব থেকেই টেলিফোন কবছি।"

শুভঙ্কর ক্লাবেব সিঁড়ি বেয়ে উঠতে না উঠতে অলকা চৌধুরী উদ্ধশ্বাসে এসে সম্মুখে দাঁড়াল। সে খুশিতে ঝলমল কবছে। বলল, "ড্রাইভের উপর চোখ রেখে এতক্ষণ বসে ছিলাম। হাতে ম্যাগাজিনটা খোলা ছিল। এক অক্ষরও পড়ি নি।"

শুভঙ্কব পুলকিত হল। কিন্তু সৌজন্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলল, "কেন কষ্ট করতে গেলেন ? আমি এসে নিশ্চয়ই খবর দিতাম।"

শুভঙ্করের চোখে চোখ রেখে অলকা চৌধুবী বলল, "এ ভাবে কষ্ট কবাব কি কোনো মূল্য নেই ?"

শুভঙ্কর এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে ?

অলকা চৌধুরী বলল, "এভাবে কষ্ট করতে আমার ভালো লাগে।"

শুভঙ্কব পবিহাস কবতে গিয়ে বলল, "কিন্তু আমার জায়গায় আমার বেয়ারাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখলে আপনার মনের অবস্থা কী হত ?"

অলকা চৌধুরীর দুচোখ দিয়ে একটা আগুনের হলকার মতো বার হতে গিয়ে নিভে গেল। শুভঙ্করকে দেখতে দেখতে রুদ্ধকণ্ঠে বলল,

"আপনার হঠাৎ কী হয়েছে ভেবে আমার কী অবস্থা হত কে জানে!" পরে বলল, "বেয়ারা পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন, একথা বিশ্বাস করতে পারতাম না।"

শুভঙ্কর বিশেষ অপ্রস্তুত বোধ করল। মুখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হল।

শুভঙ্করের অবস্থা দেখে অলকা চৌধুরী ঈষৎ হেসে বলল, "এখন চলুন। বারান্দায় কোথাও খানিকক্ষণ বসে ফলের রস খাওয়া যাক।"

প্রথম দিনের টেবিলটাতেই দুজনে মুখোমুখি বসেছিল। শুভঙ্করকে দেখতে দেখতে অলকা চৌধুরী বলল, "কদিন খোঁজ নিতে পারি নি। আপনি কি রকম আছেন মিস্টার ঘোষ?"

শুভঙ্কর বলল, "ভালো।"

অলকা চৌধুরী মাথা নেড়ে বলল, "না।"

শুভঙ্কর মুখ তুলে তাকালো। বলল, "কেন? চেহারায় খারাপ কিছু দেখছেন?"

অলকা চৌধুরী জবাব দিল, "আপনাকে বিশেষ অন্যমনস্ক ঠেকছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা দুশ্চিন্তা বা সমস্যা এড়াতে গিয়েও এড়াতে পারছেন না।"

শুভঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে ফেলল না। কিন্তু অলকা চৌধুরীর দিকে না তাকিয়ে পারল না।

অলকা চৌধুরীর চোখে একটা জিজ্ঞাসা গভীর হল। বলল, "না জেনে বুঝে আমি একটা কারণ হয়ে পড়ি নি তো?"

শুভঙ্কর এই সূক্ষ্ম পরিস্থিতির অর্থ সম্পূর্ণ ভুল বুঝে বলল, "না, আপনি কারণ হতে যাবেন কেন?"

অলকা চৌধুরীর চোখের আলো নিভে গেল। তাকে হঠাৎ অসম্ভব ম্লান দেখালো। যেন নিজের ভিতরে পা পিছলে পড়ে যাবার মতো হল। কিন্তু প্রাণপণে সে নিজেকে সামলে নিল। খানিকক্ষণ

নীরব থেকে বলল, "তবে আপনার কী হয়েছে মিস্টার ঘোষ ?"

শুভঙ্কর না হেসে পারল না। এই হাসি তার মুখের পাণ্ডুরতাকেই স্পষ্ট করে তুলল।

অলকা চৌধুরী বলল, "বলুন।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কী ভাবছি, কেন ভাবছি। এ অবস্থায় আপনাকে কিছু বলতে যাওয়া উচিত হবে না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "উচিত অনুচিতের প্রশ্ন ছাড়ুন। আমি জানতে চাই। আমার কি অধিকার নেই ?"

শুভঙ্কর ভাবল কী আশ্চর্য! চৌধুরী কাস্‌লয়ের কানুনে একদিনে কি এক বছরের হিসেব দিতে হয় ? বলল, "আছে। আছে বলেই কিছু বলতে চাই না। ভুল বুঝতে পারেন। ভাবতে পারেন অধিকার নেই।"

অলকা চৌধুরীর দৃষ্টি স্নিগ্ধ কোমল অন্ধকারে আর্দ্র হয়ে উঠল। আসক্তিসিক্ত মধুর কণ্ঠে টেবিলের উপর ডান হাতটা দিয়ে শুভঙ্করকে স্পর্শ করে বলল, "বলুন। আমার অধিকার আমার হাতে। যদি না বুঝে কেড়ে নিতে চান, তা হলেও।"

শুভঙ্করের ভিতর একটা ব্যথার সঙ্গে আর একটা ব্যথা দানা বাঁধল। একেবারে নীরব থাকা সম্ভব নয়। বলল, "অতিথি মহলে আছি। এটাই কি একটা ঘটনা নয় ?"

অলকা চৌধুরী বলল, "অতিথি মহলের বাইরেও তো আছেন !"

শুভঙ্কর বলল, "তা সত্ত্বেও চৌধুরী কাস্‌লয়ে অতিথি মহলে আছি এ কথাটাই বড় হয়ে উঠছে।"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করল, "মহারানীর কথা ?"

শুভঙ্কর জবাব দিল না।

অলকা চৌধুরী বলল, "চৌধুরী কাস্‌ল্ আর অতিথি মহল থেকে আমিও তো আলাদা নই।"

শুভঙ্কর বলল, "নিশ্চয়ই নন।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তা হলে আমার কথা ?"

শুভঙ্কর বলল, "আজ নয়। যেদিন বলার সময় আসবে, বলব।"

শুভঙ্করের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে অলকা চৌধুরী বলল, "অতিথি মহলের মৌনী তরুণীর কথা ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমার কাছে তার কোনো প্রশ্ন নেই বলেই হয়তো তার সম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জমা হয়েছে। তার কথা কখনো কখনো মনে হওয়া স্বাভাবিক।"

অলকা চৌধুরী ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, "দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন ?"

শুভঙ্করকে নীরব দেখে অলকা চৌধুরী খানিকক্ষণ কী চিন্তা করল। পরে ধীরে ধীরে বলল, "মহারানীর সঙ্গে কবে শেষ কথা হল ?"

শুভঙ্কর বলল, "কথা শেষ হয় নি। সবে শুরু হয়েছে।"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, "কবে শেষ ডেকেছিলেন !"

শুভঙ্কর জবাবে বলল, "এক অর্থে কাল। বিশেষ অর্থে 'শেষ' কথার কোনো অর্থ নেই।"

অলকা চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝেছি। মহারানী আপনাকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছেন ?"

শুভঙ্কর হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে বলা যায় বলল, "অতিথি মহলে তিনটি অতিথি কয়েকটা বছর কাটিয়ে গেলেন। তাঁদের কাছ থেকে আপনার এই প্রশ্নের কী উত্তর পেয়েছিলেন ?"

অলকা চৌধুরী বলল, "সেদিনের প্রশ্নের যুগ কেটে গিয়েছে। সেদিনের উত্তরে আজ কোনো প্রয়োজন মিটবে না। আপনাকে নিয়ে একটা নতুন যুগ শুরু হয়েছে। নতুন উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি।"

শুভঙ্কর অলকা চৌধুরীর কথা শুনল। মনের কথা মনে চাপা দিয়ে বলল, "আপনার সম্বন্ধে কী উত্তর পেয়েছিলেন ?"

অলকা চৌধুরী বলল, "সে উত্তর এ যুগে অর্থাৎ আমার নতুন যুগে অচল।"

শুভঙ্কর বলল, "তবু আমার কি জানবার অধিকার নেই ?"

অলকা চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে শুভঙ্করকে একটা নরম ঠেলা দিয়ে বলল, "পুরনো ইতিহাস জানবার অধিকার আমাদের দুজনের কারোরই নেই। অধিকার শুধু নতুন ইতিহাস শুরু করার। এই অধিকার নিয়েই আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান। এ অধিকার যদি না খাটান, কিংবা আমাকে খাটাতে না দেন, আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাবে।"

শুভঙ্কর এক দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তার নিষ্পলক দৃষ্টি অলকা চৌধুরীর উপর। অলকা চৌধুরী হঠাৎ কলহাস্যে তার দিবাস্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করে বলল, "ভূত দেখছেন না কি ? আসুন।" শুভঙ্করকে প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে সে উর্দ্ধশ্বাসে ডাইনিং রুমের দিকে এগোলো।

অফিসে ফিরে শুভঙ্কর আমেদকে চারপৃষ্ঠাব্যাপী এক চিঠি লিখল। চার পৃষ্ঠায় যতটা সম্ভব তার বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিল। উপসংহারে লিখল, "সম্ভব হলে কয়েকটা দিনের ছুটি নিয়ে এসো। তোমার অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।"

মাঝরাতে অলকা চৌধুরী চৌধুরী কাস্‌লয়ে অন্দর মহলে মহারানীর ঘরে ঢুকল। মহারানী জেগেই ছিলেন। স্তব্ধ রাতে পুরু কার্পেটে পায়ের শব্দ চাপা পড়েও পুরোপুরি চাপা পড়ল না। মহারানী বিছানায় উঠে বসলেন। বেড সুইচ টিপতে নীলচে আলোয় ঘর ভরে গেল।

মহারানী বিস্মিত হলেন। বললেন, "অলকা ? এত রাতে ?" মহারানী উঠে মেহগিনির ক্যাবিনেটের উপরের বড় ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলেন। ঘর ঠাণ্ডা স্বচ্ছ আলোয় ভেসে গেল।

মহারানী বললেন, "বোস্। এত রাতে হস্টেল থেকে কী করে এলি ? পার্‌মিশন্ নিয়ে, না, এমনি ?"

অলকা চৌধুরী হাসতে গিয়ে মহারানীর মুখভাব লক্ষ্য করে থেমে গেল। সে হস্টেলের দারোয়ানকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে এসে ঝড়ের মতোই মহারানীর মহলে ঢুকেছিল। মহারানীর শয়নকক্ষের সম্মুখে এসে তার গতি মন্দ হয়ে এসেছিল। কিন্তু তার বুকে আগুন জ্বলছিল। মুখে তলোয়ারের মতো এক সার কথা উদ্যত ছিল। কিন্তু চিরদিনের মতো তার এই প্রস্তুতি শরতের আকাশে ঝুটো ঝড়ের মহলার মতো মিলিয়ে গেল। তবু বারবার সে নিজেকে বলতে লাগল, আজ সে কথা বলবেই। অন্ততঃ একটা কথা, যে-কথা বলি বলি করেও এতকাল বলে নি।

মহারানী বসতে অলকা চৌধুরী ধীর পদে এসে তাঁর মুখোমুখি একটা সোফায় বসল।

মহারানী শান্তকণ্ঠে বললেন, "তোকে দেখে মনে হচ্ছে, কী যেন বলতে চাস। বল।"

অলকা চৌধুরী বলল, "যখন তোমার সঙ্গে অতিথি মহল নিয়ে আমার প্রথম কথা হয়, তুমি আমাকে অতিথি মহলের তরুণী সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলে। আলাপ পরিচয় দূরেব কথা, সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে বলেছিলে।"

মহারানী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কারণটাও বলেছিলাম।"

অলকা চৌধুবী বলল, "মহারানী! কারণ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই।"

মহারানী হাসলেন। এ হাসি ঐতিহাসিক। মহারানী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অনন্য হাসি। অলকা চৌধুরীর জায়গায় কোনো বিদেশী শক্তির রাজদূত বসে থাকলেও এ হাসি অপ্রাসঙ্গিক হত না। মহারানী বললেন, "ঝগড়াটা কী নিয়ে?"

অলকা চৌধুরী বলল, "অতিথি মহলের নাটকে আমরা তিনটি চরিত্র। আমার সমান অধিকার তুমি ঐ তরুণীকে দিয়েছ। তাকে এড়িয়ে চলা এক কথা। কিন্তু তাকে একেবারে আমার কাছ থেকে

আড়াল করে রেখেছ।"

মহারানী বললেন, "বিদিশাকে আড়াল করে না রাখলে সে আড়ালে থাকবে না। তাকে সহজে এড়িয়ে চলা যাবে না। নিজের সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। একবার তোকে ধরাছোঁয়ার ভিতর পেলে তোর জীবনে কোন্ সর্বনাশ ডেকে আনবে কে জানে! পৃথিবী জানে বিদিশা নেই। তার কলঙ্কের কাহিনী স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবার মতো। সেখানে কোনোরকমেই নতুন করে তুলির আঁচড় না লাগে।"

অলকা চৌধুরী ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালো। বলল, "মহারানী! ভুল বুঝো না। এই লুকোচুরির খেলা নিছক রহস্য বলে মন মেনে নিতে চায় না। কয়েকটা দিন ধরে মন আমার সন্দেহে অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে ঐ তরুণীর হাতে কোনো কারণে আমি ঠকে যাচ্ছি।"

মহারানী বললেন, "কী বুঝিস! কী চিন্তা করিস! মাঝরাতে হস্টেল পালিয়ে এসে এই যে অনর্গল বকে চলেছিস, শুনলে কে না তোকে পাগল ঠাওরাবে। ডাক্তারকে দিয়ে ভালো করে মাথাটা পরীক্ষা করিয়ে নে। নিজে হাঙ্গামা পোযাতে না চাস আমি বিক্রম শাকে বলে দিচ্ছি?"

অলকা চৌধুরী যেন অবাক হল, "তাহলে বিক্রম শার সঙ্গে তোমার কথা হয়?"

মহাবানী বললেন, "দু তিন দিন হল এস্টেটের কাজে মন দিয়েছি। পুরোপুবি নয়। ওপর ওপর। এবং তাও জাফরীর আড়াল থেকে।"

অলকা চৌধুবী মহারানীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। মহারানীব কথা শেষ হতে বলল, "তোমার একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।"

"পরিবর্তন?" মহারানী হাসলেন। এ হাসিতে অস্বস্তি প্রকাশ পেল।

অলকা চৌধুরী বলল, "মহারানী! মনে হচ্ছে তুমি জেগে উঠেছ। স্থিতির শান্ত ধ্যান থেকে গতির প্রচণ্ড ধ্যানে। তোমাকে দেখে মনে হত তুমি এমন একটি সূর্য, যে তার সৌরলোক থেকে সবকটি গ্রহকে নির্বাসন দিয়েছে। এখন মনে হয় তোমার সৌরলোকে কোনো গ্রহ না থাকলেও তোমার প্রচণ্ড টানে অন্য সৌরলোক থেকে যে কোনো গ্রহকে পরিণামের কথা চিন্তা না করে তোমার কাছে নিয়ে আসবে। তোমার আকর্ষণ আজ তোমার মুখে চোখে অনেক দিনের চাপা আগুনের মতো ফেটে পড়ছে। তোমাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছি না।"

মহারানী বললেন, "কে ফেরাতে বলে! আমি একা। স্বেচ্ছায় নির্বাসনে আছি। আমাকে দুচোখ ভরে দেখবে, কে আছে? তুই দ্যাখ।"

অলকা চৌধুরী মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, "মহারানী!"

মহারানী বললেন, "কী বলবি বল।"

অলকা চৌধুরী বলল, "একটা আরজি নিয়ে এসেছিলাম।"

মহারানী কোনো কথা বললেন না।

অলকা চৌধুরী বলল, "অতিথি মহলের তরুণীকে একবার দেখতে চাই।"

মহারানী বললেন, "বিদিশাকে? নতুন করে কী দেখবি?"

অলকা চৌধুরী বলল, "তবু একবার দেখতে ইচ্ছে হয়।"

মহারানীকে চিন্তিত মনে হল। কিন্তু শান্তকণ্ঠেই জবাব দিলেন। বললেন, "বেশ। সুবিধে মতো একদিন ব্যবস্থা করে ডেকে পাঠাবো।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আজ রাতে এখনই তো হতে পারে। অতিথি মহল ক মিনিটের পথ?"

মহারানী বললেন, "বেশ। তুই পাশের ঘরে বিশ্রাম কর। আমি শুতে যাই। যাবার আগে ব্যবস্থা করছি।"

মহারানীকে দেখতে দেখতে অলকা চৌধুরী বলল, "আমার

অনুরোধের সঙ্গে একটা সর্ত জুড়ে না দিয়ে পারছি না।"

মহারানী বললেন, "সর্ত ? কী সর্ত ?"

অলকা চৌধুরী বলল, "ঐ তরুণীর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের সর্ত। আমি তোমার ঘরে তোমার সম্মুখে ঐ তরুণীকে দেখতে চাই।"

মহারানীর মুখের রেখা কঠিন হয়ে এল। বললেন, "অসম্ভব !"

অলকা চৌধুরী বলল, "কেন মহারানী ?"

মহারানী বললেন, "জীবনে সব কেনর জবাব পাওয়া যায় না।"

অলকা চৌধুরী উঠে দাঁড়াল। মহারানীর সম্মুখে এসে বলল, "বুঝলাম। তবু তোমাকে একবার প্রণাম করতে দাও মহারানী। গভীর প্রয়োজনে যদি কখনো তোমাকে আঘাত করে বসি, ভুল বুঝো না।"

মহারানী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অলকা চৌধুরী চলে যাবার পর তাঁর জীবনের একটা কূট রহস্য নিয়ে ভাবতে বসলেন। তাঁর শরীরের স্পন্দন অস্পষ্ট হয়ে এল। তিনি অতীতের একটি বিশেষ দিনে ফিরে গেলেন।

মহারাজ ত্রিবিক্রমের মৃত্যুর কিছুকাল পরে একদিন অপরাহ্ণে মহারানী তমিস্রার চায়ের টেবিলে আহ্বান পেয়ে ষোড়শী অলকা চৌধুরী এসেছিল। রানীমহলের বারান্দায় দু বোন মুখোমুখি চায়েব টেবিলে বসেছিলেন। কনিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে তমিস্রার দুটি চোখের আলো নরম হয়ে এল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাঁর চরিত্রোচিত কঠোর নিস্পৃহতা আবার তাঁকে অতি নিকটের দুরধিগম্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। যে দেবী ক্ষমা ও অনুরাগের উর্দ্ধে, যিনি শুধু নিজের নিগূঢ় প্রয়োজনে বরদাত্রী, তাঁরই ভীষণা প্রতিমার মতো তমিস্রা ছিলেন অপরূপ ও ভয়ঙ্কর। তাঁর ভয়ঙ্করতার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। স্থূলদৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ত না। কিন্তু তমিস্রার এই দ্বৈতরূপ কখনো অলকা চৌধুরীর নজর এড়িয়ে যেতে পারত না,

সেদিনও এড়াল না। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো সেদিন অলকা চৌধুরী তমিস্রার এই দ্বৈতপ্রকাশকে যেন স্বচ্ছন্দে নিতে পারল না। কোথায় যেন ভয় ও অস্বস্তি থেকে থেকে সাড়া দিতে লাগল। রানীমহলের বারান্দায় অপরাহ্ণের বিবর্ণ আলোয় সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করল।

চায়ের টেবিলে তিনজনের জন্য সাজসরঞ্জাম সাজানো ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে অলকা চৌধুরী বলল, "মহারানী! আর কাকে ডেকেছ?"

মহারানী স্বাভাবিককণ্ঠে বললেন, "বিদিশাকে।"

অলকা চৌধুরী সবিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলল, "বিদিশাকে?"

মহারানী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ। বিশ্বাস করা যত কঠিনই হোক, জেনে রাখ বিদিশা আছে। কিন্তু শুধু আমার ও তোর কাছে। পৃথিবীর আর কারো কাছে নয়।"

রুদ্ধকণ্ঠে অলকা চৌধুরী বলল, "বিদিশা জীবিত?"

মহারানী সহজ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ। শুধু জীবিত নয়, নিউ দিল্লীতেই আছে।"

বিস্ময়ে অলকা চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে গেল। পরে মৃদুস্বরে বলল, "এতদিন বলো নি। আজ হঠাৎ—"

মহারানী বললেন, "আজ বলাব সময় হয়েছে। শুনলেই বুঝবি।" অলকা চৌধুরীকে গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে মহারানী বললেন, "মহারাজা বলতেন. আমরা তিন বোন জীবনের তিনটে দিক। জীবনের হাত থেকে তিনজন তিন রকম ফল পাবো। কিন্তু যে-ফল অমূল্য, জীবন সহজে দিতে চায় না, একজনই পাবে। কে পাবে তা নির্ণয়ের ভার জীবনের উপর। আমরা তিন বোন একদিন জীবনের চাওয়া পাওয়ার খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী হবো একথা মহারাজা একদিন বলেছিলেন। তখন আমি ষোড়শী। বিদিশার বয়স বারো, তুই ছ বছরের। কেন মহারাজা একথা বলেছিলেন জানি না। কিন্তু

জানার ইচ্ছে প্রতি মুহূর্তে হত। এখন এই ইচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন তো একটা বিচিত্র খেলা। জানা গেলে এই খেলার ভিতর দিয়েই জানা যাবে। কিন্তু খেলা কবে আরম্ভ হবে অপেক্ষায় না থেকে খেলা শুরু করে দিতে চাই।" একসঙ্গে মহারানীর কণ্ঠে আকাঙ্ক্ষা ও বৈরাগ্যের সুর বাজলো। বললেন, "নারী কী ফল পেল, নারী হিসাবেই হয়তো শেষমেষ খতিয়ে দেখতে হয়। মানুষ কথাটা অনেক বড়। কিন্তু বড় হিসেবের লোভে আসল হিসেব ভুললে নারী হিসেবে সে ব্যর্থ। পুরুষের কষ্টিপাথরে সে কী দাগ রাখল, ফলাফলের এ হচ্ছে চূড়ান্ত বিচার। বিদিশা—" মহারানী হঠাৎ নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, "বিদিশা পরে মহারাজার কথা আমার মুখে শুনে বলেছিল, "সবচেয়ে সেরা ফল তাহলে আমার ভাগ্যে, ধরে নিতে পারো। তোমরা কেউ প্রেমিকের, কেউ ঈশ্বরের সাধনায় কালক্ষয় করবে, ফলের জন্য হাত পেতে বসে থাকবে। আমি ততক্ষণ পুরুষমেধ যজ্ঞ শেষ করে আমার অদৃষ্ট জয় করব। বিদিশার—তোর মনে থাকবার কথা নয়—বিদিশার সৃষ্টিছাড়া রূপের তুলনা খুঁজে পাই না। তোকে আমাকে কে রূপসী না বলবে? কিন্তু বিদিশার রূপ! ঐ রূপই একদিন ওর কাল হল। দিনের পর দিন চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হয়ে একদিন নিয়ম ও শাসনের বাঁধ ভেঙে ও অকল্যাণের পথে বার হয়ে পড়ল। দেবতার অভিসারে বার হলে দেবতার টনক নড়ত, সেই বিদিশা যেচে কলঙ্কের কালি মেখে জীবনে অপাঙক্তেয় হয়ে গেল। তবু বিদিশার সেদিনের অহঙ্কার এখনো আমাকে আঘাত করে। প্রমাণ করতে ইচ্ছা হয় পুরুষজয়ের দিব্যাস্ত্র রূপ নয়, অ-রূপ। যে-রূপ বাইরে চমক দেয়, আলোয় নকশা আঁকে জীবনে তার দখল কতটুকু? কিন্তু যে-রূপ আলোর অন্তরালে অন্ধকারে ধরা দেয়, তার শেষ কোথায়?"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এই জন্যই জাফরীর আড়ালে সরে এসেছ?"

মহারানী যেন অলকা চৌধুরীর কথা শুনেও শুনলেন না। কথার খেই টেনে বললেন, "পুরুষকে রূপের ফাঁদে টেনে এনে বন্দী করে পঙ্গু করে নারীর মান বাড়ে? না তার কীর্তির খাতায় মোটা অঙ্ক জমা হয়? পুরুষকে রূপের মারণাস্ত্রে সংহার করে নারী কোন্ হিসেবে সম্পূর্ণ হয়? সার্থক হয়? কিন্তু পুরুষের চোখ যদি তার ভিতরে ফেরাতে পারে, তাকে রূপান্ধ না করে যদি দিব্যরূপের জন্য উন্মুখ করে তুলতে পারে, যদি তার ভিতর তার ঈশ্বরকে জাগিয়ে সেই ঈশ্বরকে তিলে তিলে বাড়িয়ে তুলতে পারে, নারী শুধু প্রেমে সফল হয় না, প্রেম ও ঈশ্বরকে একসঙ্গে পেয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ফল পায়।"

অলকা চৌধুরী নীরবে মহারানীর কথা শুনছিল।

মহারানী বললেন, "তোর প্রমাণ দিতে ইচ্ছে হয় না?" অলকা চৌধুরীর কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বললেন, "মানুষ যখন নিজেকে খুঁজে পায় কাকে পায়?"

অলকা চৌধুরী জবাবে বলল, "কাকে পাবে? মানুষকে।"

মহারানী সবেগে ঘাড় নেড়ে বললেন, "না না। তার নিজের ঈশ্বরকে। মানুষ বেড়েও যদি শুধু মানুষই থাকে তবে সে মানুষ কিসে? মানুষের বর্তমান, অর্থাৎ তার হাতের মুঠোর মানুষ, তাকে খুঁজে তার কোন লাভ? সে খোঁজে তার ভবিষ্যতকে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে।" কনিষ্ঠার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "বুঝেছি। তোর পৃথিবী মানুষের স্বর্গ। সেখানে মানুষ ছাড়া আর কারো প্রবেশ নিষেধ। সবার উপরে মানুষ সত্য এই সুরে তুই জীবনের সবকটা তার বেঁধে নিতে চাস।"

বিকেলের একফালি রোদ মহারানীর গায়ে এসে পড়েছিল। চেয়ারটা ছায়ায় সরিয়ে এনে বসে মহারানী বললেন, "বিদিশার সঙ্গে কথা তখনই হয়েছিল। তুই তখন ছোট ছিলি। এতদিনে তোর সঙ্গে কথা বলার সময় হয়েছে। তাই তোকে আজ ডেকেছি।"

মহারানী কী বলেন চিন্তা করে কৌতূহলে ও অস্বস্তিতে অলকা চৌধুরীর মন উত্তাল হয়ে উঠল।

মহারানী বললেন, "বিদিশার অহঙ্কারের জোর কত দেখতে চাই। এই অতিথি মহলে পুরুষজয়ের খেলার ভিতর দিয়ে আমরা প্রমাণ করব পুরুষের ভিতর নারী কাকে দেখে, কাকে পায়, জীবনের হাত থেকে কী ফল পায়। তোকে এ খেলায় যোগ দিতে হবে। তুই রাজার মেয়ে। নিজেকে প্রেমের কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রমাণ কর। অতিথি মহলে নিত্য নতুন অতিথি না এসে লম্বা মেয়াদে একজন আসবে। তাকে নিয়ে আমাদের তিনজনেব অদৃষ্ট পরীক্ষা শুরু হবে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর বেলায় আমরা একজোট। কেউ এ খেলায় উৎপাত ঘটাতে এলে তিনজন মিলে বাধা দেব। অতিথি মহলের এ খেলা আমাদের তিন বোনের গোপনসত্য। বাইরের পৃথিবীকে বিন্দুবিসর্গ জানানো চলবে না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "কিন্তু বিদিশা—"

অলকা চৌধুরী তার কথা শেষ করতে পারল না। মহারানী সুদীর্ঘ বারান্দার শেষপ্রান্তে কী দেখছেন? কাকে দেখছেন? তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অলকা চৌধুরী সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। বারান্দার শেষে দোতলার সিঁড়ির মাথায় যে এসে দাঁড়িয়েছে দূর থেকে তাকে দেখে মহাবানী বলে ভুল হয়। তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু সে—বিদিশা—রহস্যের আশ্রয় নিয়েছে। তার মুখে রেশমের জালি। সে নির্বাক।

অলকা চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে বিদিশার নাম ধরে ডাকতে গেল। কিন্তু মহারানীর দুটি চোখের কঠোর দৃষ্টি তখন তাব উপর এসে পড়েছে। বিদিশার নাম তার কণ্ঠে জমে গেল। বিদিশাও যেন সম্মুখে এক পা অগ্রসর হতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর সে পিছন ফিরে কয়েক পা গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

অলকা চৌধুরী হতাশস্বরে বলল, "বিদিশা এসেও এল না।"

মহারানী বললেন, "চায়ের টেবিলে ওর স্থান হয়েছে, দূর থেকে দেখে গেল। ওর পক্ষে এই যথেষ্ট। ওর আসা চলে না।"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, "কেন ?"

মহারানী বললেন, "ওর কাছ থেকে তোকে তফাতে রাখতে চাই। ও জীবনের রাহু। তোকে গ্রাস না করে।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমার কাছ থেকে নয় আড়ালে রাখলে। কিন্তু আর সকলের কাছ থেকে কী করে আড়াল করবে ?"

মহারানী বললেন, "রেশমী জালির আড়ালে ওর মুখ কেউ দেখবে না। ও মৌনী। ওর কথা কেউ শুনবে না।"

অলকা চৌধুরী অস্ফুটস্বরে বলল, "এ কী শাস্তি !"

মহারানী বললেন, "শাস্তি নয়। ওর রক্ষা-কবচ। পৃথিবীর কাছ থেকে ওর সত্য লুকিয়ে ওকে বাঁচবার ও নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া।"

মহারানী কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খাটো গলায় বললেন, "তুই রাজী তো ?"

অলকা চৌধুরী যন্ত্রচালিতের মতো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

মহারানীর মুখ প্রসন্ন হল। বললেন, "আজ তবে আয়।"

রানীমহল থেকে অলকা চৌধুরী মনে দুটি প্রশ্ন নিয়ে এল। প্রথম প্রশ্ন, মহারানী তমিস্রার লক্ষ্য প্রেমিক না ঈশ্বর। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে-বিদিশা পৃথিবীর চোখে থেকেও নেই তার সঙ্গে মহারানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কী করে সম্ভব ? বিদিশা কি উপলক্ষ্য মাত্র—না কৈফিয়ত ? মহারানীর প্রতিদ্বন্দ্বী কে ? কার কাছে মহারানী কী প্রমাণ করতে চান ? আর সে নিজে ? মহারানীর উদ্দেশ্যের খুঁটিমাত্র ? আর কিছু নয় ?

স্মৃতিপথে মহারানী তমিস্রা অতীতের এই দিনটিতে ফিরে গিয়েছিলেন। সেদিন অপরাহ্নে তাঁর কনিষ্ঠা মনে কোন্ সন্দেহ নিয়ে

বিদায় নিয়েছিল, আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজ রাতে বুঝলেন সন্দেহ প্রেমকে কী তীব্র করে তোলে। আরো বুঝলেন এখন থেকে অলকা চৌধুরী আর কারো ক্রীড়নক নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং প্রয়োজন হলে আঘাত করতে দ্বিধা করবে না।

অলকা চৌধুরীর ক্লাবে অপরাহ্নে বিক্রম শা আবির্ভূত হলেন। স্বেচ্ছায় নয়, তলব পেয়ে।

অলকা চৌধুরী চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে প্রতীক্ষায় ছিল। বেয়ারার পিছনে বিক্রম শা হাজির হতে সম্মুখের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, "বসুন।"

বিক্রম শা বললেন, "মহারানী চৌধুরী কাস্‌লয়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে আজ ভোর থেকেই ভীষণ কড়াকড়ি শুরু করেছেন।"

অলকা চৌধুরী বিস্মিত হবার ভান করে বলল, "কেন? হঠাৎ?"

বিক্রম শা বললেন, "অতিথি মহল সম্বন্ধে, বিশেষ করে অতিথি মহলের তরুণী সম্বন্ধে একটা কড়া নিয়ম চিরকালই ছিল। কিন্তু নিয়মটা এখন গোটা চৌধুরী কাস্‌ল্ সম্বন্ধে খাটানো হচ্ছে। আগে হলে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারতাম। কিন্তু এখন সে পথ বন্ধ। অগত্যা একটা কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়ে আসতে হল।"

অলকা চৌধুরী বলল, "ও!" তারপর বিক্রম শা যাতে কোনো প্রকারেই তার উদ্দেশ্য আঁচ করে উঠতে না পারেন, খুব সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "অতিথি মহলের ঐ তরুণী আমার দুচোখের বিষ। কখনো দেখি নি, দেখবার আগ্রহও নেই। আপনি দেখেছেন কি না জানি না।"

বিক্রম শা চায়ের কাপ মুখে তুলেছিলেন। তারই আড়াল থেকে সতর্ক দৃষ্টিতে অলকা চৌধুরীকে দেখে নিলেন। কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বললেন, "না, সে সৌভাগ্য হয় নি। কৌতূহল যে হয় নি তা নয়। তবে কৌতূহল চরিতার্থ করতে গেলে যে পরিমাণ দুঃসাহসের প্রয়োজন, আমার চরিত্রে তার একান্ত অভাব।"

অলকা চৌধুরী বলল, "এককালে দুর্ধর্ষ শিকারী হিসেবে আপনার নাম ছিল।"

বিক্রম শা হেসে বললেন, "জানোয়ারের বেলায়। মানুষের বেলায় নয়।"

অলকা চৌধুরী হেসে বলল, "মহারানীর এত কাছে থেকেও মানুষ শিকারের নামে ভয় পান?"

বিক্রম শা সভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। গলা নামিয়ে বললেন, "আপনার কথার অর্থ ধরতে পারলাম না মিস চৌধুরী। মহারানী কবে কোথায় মানুষ শিকার করলেন?"

অলকা চৌধুরী বলল, "অতিথি মহলে তিন তিনটে জাঁদরেল মানুষ শিকার হল এ ঘটনা অলীক বলে উড়িয়ে দিতে চান?"

বিক্রম শা ভেবে বললেন, "হয়তো এ রকম একটা কথা আধ্যাত্মিক অর্থে বলা চলে। কিন্তু মানুষের চোখে মানুষের আইনে অতিথি মহলের তিনটি মৃত্যুই স্বাভাবিক রকমে দেহযন্ত্রের জ্ঞাত কারণে ঘটেছে।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তা হলে আপনি প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন মনের উপর চাপ দিয়ে মানুষের শরীরকে ক্রমে ক্রমে বিকল করে দিয়ে একদিন ভিতরের যন্ত্রটা থামিয়ে দেওয়া যায়?"

বিক্রম শা অলকা চৌধুরীর কথা শুনছিলেন, নাকি তার মুখে চোখে কোনো কূট অভিসন্ধির প্রমাণ খুঁজছিলেন, তাঁকে দেখে বলা কঠিন হত। তিনি অলকা চৌধুরীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর শূন্য দৃষ্টি অলকা চৌধুরীর পিছনের দেয়ালটার উপর গিয়ে পড়ল।

অলকা চৌধুরী বলল, "আমার প্রশ্নের জবাব আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। শত হলেও আপনি চৌধুরী এস্টেটের ম্যানেজার।"

বিক্রম শা বললেন, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। থাকলেও পাবার আশা করা উচিত নয়। কারণটা আপনি জানেন। আমি চৌধুরী এস্টেটের ম্যানেজার।"

অলকা চৌধুরী জোর করে হাসল। না হেসে উপায় ছিল না। তবু অনন্যোপায় অবস্থায়ও সে একটা উপায় বার করার চেষ্টা করল। বলল, "মিস্টার শা! আপনি চৌধুরী এস্টেট থেকে কত পান?"

বিক্রম শা বললেন, "কত মাইনে পাই আপনি জানেন মিস চৌধুরী।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমি মাইনের কথা তুলছি না মিস্টার শা। মোট কত পান জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

বিক্রম শা বিহ্বল বোধ করলেন। বললেন, "কী আশ্চর্য! মাইনে ছাড়া আমি এক পয়সাও অতিরিক্ত পাই না।"

অলকা চৌধুরী চোখ কপালে তুলে বলল, "সে কি! আমার ধারণা ছিল মহারানীর কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা আপনি পান!"

বিক্রম শা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অলকা চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম কোনো কথা মহারানী বলতে পারেন না।"

অলকা চৌধুরী জিভ কেটে বলল, "ছি ছি। মহারানী বলবেন কেন? আমি অনুমান করেছিলাম।"

বিক্রম শা ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, "এই অনুমানের অর্থ আমি ঠিক বুঝলাম না মিস চৌধুরী।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আপনি সমাজের যে স্তরের লোক চৌধুরী এস্টেটের মাইনেতে কী করে আপনার চলে ভেবেই একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম। যদি আপনার আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে থাকি, ক্ষমা করবেন।"

বিক্রম শা বললেন, "না না ক্ষমার কথা কেন বলছেন? আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার চলে না। ঐ মাইনেতে সংসার চালানো সম্ভব নয়।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তা হলে কী করে চালান?"

বিক্রম শা বললেন, "চালাই না। আমার সংসারের বালাই নেই।"

অলকা চৌধুরী কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, "সংসারই করেন নি! আপনি অবিবাহিত? অর্থাৎ আধুনিক ব্রহ্মচারী?"

বিক্রম শার প্রজাপতি গোঁফে একটা কৌতুকমিশ্রিত হাসি খেলে গেল। বললেন, "ঠিক ধরেছেন মিস চৌধুরী। আমি অবিবাহিত ও ব্রহ্মচারী। তবে সম্পূর্ণ আধুনিক মতে।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমরা দুজনেই হয়তো ভুল করছি। পুরাকালে, কোনো যুগেই আধুনিক ব্রহ্মচারীর অভাব ছিল না।"

বিক্রম শা বললেন, "আমি জীবন-বিদ্যার ছাত্র। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

অলকা চৌধুরী ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বিক্রম শার মন্তব্য কানে গেল কি না সন্দেহ। কী একটা বিষয়ে মনস্থির করে বলল, "মিস্টার শা! আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন?"

বিক্রম শা এই প্রশ্নে বিস্মিত হলেন।

অলকা চৌধুরী বিক্রম শার উত্তর অনুমান করে বলল, "আমি যদি কোনো গুরুতর ব্যাপারে আপনাকে বিশ্বাস করা দরকার মনে করি, বিশ্বাস করতে পারি? করলে বিশ্বাস রাখবেন?"

বিক্রম শা বললেন, "ব্যাপারটা খুলে বললে, বলতে পারি।" তারপর অলকা চৌধুরীর চোখে চোখ রেখে বললেন, "এস্টেটের বিরুদ্ধে, মহারানীর বিরুদ্ধে যদি যেতে না হয়, ব্যাপার যত গুরুতরই হোক বিশ্বাস রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।"

অলকা চৌধুরী বিস্ময়ের ভান করে বলল, "এস্টেটের বিরুদ্ধে? মহারানীর বিরুদ্ধে? কী আশ্চর্য! এস্টেট ও মহারানীর স্বার্থ কি আমারও স্বার্থ নয়?"

বিক্রম শা বললেন, "তা হলে ব্যাপারটা আপনি অনায়াসে আমাকে খুলে বলতে পারেন।"

অলকা চৌধুরী হঠাৎ মাথা হেঁট করল। নীচু পর্দায় বলল, "মিস্টার শা! কথাটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আপনাকে বলে মনটা হালকা করতে চাই। অনেক আগেই হয়তো বলা উচিত ছিল। কিন্তু নারীসুলভ সঙ্কোচে বলতে পারি নি।"

বিক্রম শা নীরবে অলকা চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অলকা চৌধুরী বলতে যেন বাধা পেল। অন্ততঃ তাকে দেখে এই রকম একটা ধারণা হয়, সেই চেষ্টা করল। টেবিলের চাদরে চামচে দিয়ে একটা নকশা আঁকতে আঁকতে বলল, "কিছুকাল ধরে আমি আপনার কথা ভাবছি। সব সময় জ্ঞাতসারে নয়। কখনো কখনো দেখেছি মনটা নেহাৎ ফাঁকা, এক টুকরো চিন্তা নেই। হঠাৎ চমকে উঠে টের পাই আপনার কথা কোনো একটা প্রসঙ্গের সূত্র ধরে মনে খোঁচা দিচ্ছে। মোটামুটি এক জোড়া নতুন চোখে আপনাকে দেখতে শুরু করেছি। আজ কঠিন সমস্যার সম্মুখে এসে কেন জানি না আপনার উপর নির্ভর করতে ইচ্ছে করছে।" বিক্রম শা কী বলতে যাচ্ছিলেন। অলকা চৌধুরীর কথায় বাধা পেলেন। অলকা চৌধুরী বলল, "কোনো কারণে অতিথি মহলের ব্যাপার থেকে আমি সরে পড়তে চাই। তবে খোলাখুলিভাবে নয়। অন্ততঃ মহারানীকে জানিয়ে নয়। কেন জানেন? তাতে মহারানীর অভিমানে আঘাত লাগতে পারে।" থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে বলল, "আমি ভেবে দেখেছি আমি সরে গেলে চৌধুরী কাস্‌লয়ের লাভ, মহারানীর লাভ। অতিথি মহলের তরুণী মহারানীর হাতের মুঠোয়। আমি সরে দাঁড়ালে মহারানী নিশ্চিন্ত মনে এক তরফা খেলা খেলবেন। তাঁর মনে শান্তি ফিরে এলে কাস্‌লয়েও তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, কী বলেন?"

মিস্টার শা বললেন, "বুঝলাম। কিন্তু অতিথি মহল থেকে সরে দাঁড়ানো আপনার অভিরুচি। কী করে কে বাধা দেবেন বুঝতে পারছি না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "বাধার কথা নয়। সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে একটা কিন্তুর কথা।" অলকা চৌধুরী তখনও মুখ তোলে নি। বলল, "এই কিন্তুই একটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

বিক্রম শা সুযোগ পেয়ে আনতমুখ অলকা চৌধুরীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করছিলেন। অলকা চৌধুরী অলক্ষ্যে লক্ষ্য করছিল। বলল, "যাকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি, যে আমার জন্য বিপদ যত গুরুতর হোক টলবে না, এমন কাউকে পেলে কী কথাই না বলা যায়! ভাবছিলাম আপনাকে যদি সেই বিশ্বাস দিই, তাহলেও হয়তো বাধাটা এড়ানো যায়।"

বিক্রম শা বললেন, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আপনি আমার কাজে এলে এস্টেটের ও মহারানীর উপকারই হবে। তবু, অকারণে যদি ভুল বোঝাবুঝি হয়, আপনার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে।"

বিক্রম শা তাচ্ছল্যের সঙ্গে বললেন, "কী করে? এমন পথ বার করা যেতে পারে বিপদ আপনার কিংবা আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। তবে আমি আপনার 'কিন্তু' ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে চাই।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তা হলেও আমি আপনার ভবিষ্যতের কথা না ভেবে পারি না। আমার যে আলাদা একটা ছোট এস্টেট আছে, তার ম্যানেজার নেই। আমিই গোঁজামিল দিয়ে চালাই। চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়েব চাকুরী নিয়ে যদি কোনো বিভ্রাট বাধে, আপনি সোজা আমার এস্টেটের ম্যানেজারের চেয়ারে বসবেন। এখানে যা পান তার চেয়ে মাইনে মাসে এক হাজার টাকা বেশী পাবেন। যতদিন চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের চাকরিতে থাকবেন, এক হাজার টাকা বসে বসে পাবেন।"

বিক্রম শা লুব্ধ হলেন। কিন্তু যে লোভ কিছুক্ষণ আগে অকস্মাৎ তাঁর রক্তে সাড়া দিয়েছিল, তার কাছে অর্থলোভ বাঘের মুখে কচি

পাঁঠা। বললেন, "বিক্রম শার যেমন চলছে তেমনই চলবে। টাকার কথা তুলবেন না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তবু—"

বিক্রম শা বললেন, "না। এ ব্যাপারে আমার জেদটা বজায় থাক। এখন আপনার 'কিন্তু' সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলুন।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমি মাঝরাতে শেষরাতে যখনই হোক, অতিথি মহলের তরুণীকে দেখতে চাই।"

বিক্রম শার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "নিয়মে আটকায় না। অতিথি মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মেয়েদের নয়। তবে মুশকিল এই, সোজা পথে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। মহারানী জানলে অনর্থ ঘটবে।"

অলকা চৌধুরী বলল, "পথটা আপনার বিবেচনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

বিক্রম শার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। বললেন, "তরুণীকে দেখতে চান। সামনা-সামনি না আড়াল থেকে?"

অলকা চৌধুরী বলল, "আড়াল থেকেই যদি হয়?"

বিক্রম শার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। বললেন, "সময় দিন। ব্যবস্থা হবে।"

অলকা চৌধুরী বলল, "ধন্যবাদ।"

সন্ধ্যা হয়ে এল। ক্লাবের বারান্দায় তখনও আলো জ্বলেনি। উঠবার সময় বিক্রম শা টেবিলে অলকা চৌধুরীর প্রসারিত বাহুর দিকে তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়েই সরিয়ে নিলেন। অলকা চৌধুরী হাসল। তারপরই তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে এল।

দিন দুয়েক বাদে নটায় অফিসে নিজের কামরায় ঢুকতে শুভঙ্কর দেখল আমেদ একটি চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে মহা আরামে কফি খাচ্ছে। শুভঙ্করের পায়ের শব্দে আমেদ পিছনে তাকালো। এক

লাকে চেয়ার ছেড়ে সম্মুখে এসে তার দুটো হাত বজ্রমুষ্টিতে পিষতে পিষতে বলল, "কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।"

শুভঙ্কর হতবুদ্ধি হয়ে বলল, "কেন ?"

আমেদ সহাস্যে বলল, "কারণ তুমি আমার নৌকোয় পা দিয়েছ।"

শুভঙ্কর কী বুঝবে কী জবাব দেবে স্থির করে উঠতে পারছিল না। আমেদ তার অবস্থা আন্দাজ করে বলল, "আমার নৌকোব সন্ধান অভিধানে পাবে না। আমার নৌকোর অর্থ নাগ্নী।"

শুভঙ্কর বলল, "এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে স্বপ্নেও ভাবি নি। কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।"

আমেদ বলল, "ধন্যবাদ পুরোপুরি আত্মসাৎ করা সম্ভব হবে না। সত্যের অপলাপ করা হবে।"

শুভঙ্কর বিহ্বল দৃষ্টিতে আমেদেব দিকে তাকালো।

আমেদ বললে, "তোমার চিঠি পেয়ে আসতাম না, এ কথা যেমন সত্য নয়, তোমার চিঠি না পেলেও আসতাম এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য।"

শুভঙ্কর বলল, "অফিসের কাজে ?"

আমেদ বলল, "আমেদ সেই পাত্র ?"

শুভঙ্কর বলল, "তবে ?"

আমেদ হাসতে হাসতে বলল, "বিপদের আকর্ষণে। সারা জীবন ট্রাপিজের খেলা খেলছি। হাত কিংবা পা ফসকাবার সম্ভাবনা আছে টের পেলে স্থির থাকতে পারি না। রক্ত নেচে ওঠে।"

শুভঙ্কর আমেদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা এসে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "বোসো, বোসো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ট্রাপিজের গল্প জমবে না।"

আমেদ বসতে বসতে বলল, "পৃথিবী ও জীবন বিপুল। মানুষের আয়ু অল্প। ভয় হয় ট্রাপিজের শিক্ষায় নিম্ন প্রাইমারী পাস করতে না করতেই তল্পিতল্পা গুটোতে না হয়।"

আমেদের উপস্থিতি কামরায় একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। হঠাৎ নিজের ভিতরে শুভঙ্কর অসম্ভব হালকা বোধ করল। বলল, "সে কি! আমার তো মনে হয় ইহলোকের কপালে যাই থাক, তুমি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।"

আমেদ এক চুমুকে কফি নিঃশেষ করে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলল, "আশৈশব আমার এ রকম একটা বিশ্বাস। মনে হয় মানুষের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাবার অসম্ভব ক্ষমতায় চটে গিয়ে ঈশ্বর মৃত্যুর ফাঁদ মাথা খাটিয়ে বার করেছেন। ফাঁদটা হয়তো মাথার খেলায়ই এড়ানো যায়।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "এক মাত্র পথ তো ঈশ্বরের সম্মুখে শরীরটা রেখে তাঁর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে অশরীরী হয়ে চম্পট দেওয়া।"

আমেদ চমকে উঠল। বলল, "ঘোষ! একটা সাজ্ঘাতিক কথা বলে বসেছ। বুঝে, না, না বুঝে জানি না। বুঝে বলে থাকো তো না-বলে পারব না তোমার তত্ত্বজ্ঞান হবার সময় হয়েছে।"

শুভঙ্কর বলল, "এখন তোমার বিপদের কথাটা শুনি।"

আমেদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "বিপদটা মাদ্রাজে শুরু হয়। এখানে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

শুভঙ্কর বিস্মিত হল। বলল, "আমার ধারণা বিপদ এখানে। বন্ধুপত্নী মাদ্রাজ পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন জানতাম না।"

আমেদ বলল, "বন্ধুপত্নী এখানেই। তবে, মাদ্রাজে পৌঁছে জ্ঞানোদয়ের মুহূর্তে বুঝলাম তিনি উপলক্ষ্য মাত্র। বিপদের কেন্দ্র আমার ভিতরে।"

শুভঙ্কর বলল, "তাহলে বুঝতে হবে তোমার ক্ষেত্রে বিপদের উপলক্ষ্য বিপদের সত্যকে আকর্ষণ করেছে।"

আমেদ টেবিল চাপড়ে বলল, "চমৎকার! এতটা গুছিয়ে আমিও হয়তো বলতে পারতাম না।" সিগ্রেটের ধোঁয়া একটা জটিল নকশায়

ছাড়তে ছাড়তে আমেদ বলল, "জীবনতত্ত্বের ব্যাপারে একদিন তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যাবে ঘোষ।"

আমেদ কিছুক্ষণ বাদেই চলে গিয়েছিল। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা শুভঙ্করের কাছে এসেছিল। স্নানপর্ব সেরে পোশাক বদলে সে লাঞ্চের কিছু আগে ফিরে এল। শুভঙ্কর হাতের কাজ সেরে নিল। আমেদ ততক্ষণে এক কাপ কফি শেষ করে সিগ্রেটে মনোনিবেশ করল!

লাঞ্চের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে দুজনে অফিস থেকে বার হয়ে পড়ল। আমেদ তার প্রিয় হোটেলের ডাইনিং-রুমে তার প্রিয় টেবিল ফাঁকা দেখে শুভঙ্করের ডান হাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "উই আর ইন্ লাক্ ঘোষ! মনে হচ্ছে বুদ্ধির তুরুপে খেলা মাত করব।"

লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে শুভঙ্করকে বসতে বলে আমেদ জরুরী একটা টেলিফোন করতে গেল। ফিরে এসে দেখল শুভঙ্কর গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমেদ বসবার জন্য চেয়ার টানতে শুভঙ্করের হুঁশ হল।

আমেদ মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, "চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়েব ধ্যান?"

শুভঙ্কর বলল, "ধ্যান বলব না। একটা একটানা চিন্তা।"

আমেদ বলল, "আমার বিপদ, এই নতুন নয়। নতুন রকমেরও কিছু নয়। আমার রক্তে শুরু হয়ে বুকে মাথায় ছড়িয়েছে। তোমার বিপদ শুরু হয়েছে ভিন্ন স্তরে, একটা নূতন অভিজ্ঞতায়। বুক থেকে মাথায়, কিংবা মাথা থেকে বুকে। রক্তে ছড়িয়েছে কি না, ছড়ালেও কতটা ছড়িয়েছে, তুমি জানো। তবে সেটা গৌণ ব্যাপার। আসল বিপদ অভিজ্ঞতায়। ঐ অভিজ্ঞতা তোমার ধ্যান ধারণার জগৎটা বদলে দিতে পারে।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার কথা হয়তো ঠিক। কারণ প্রতিদিনের জীবনটা অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি। একই শহরে একই

অফিসে কাজ করছি। একই আকাশের তলায় আছি। অথচ মনে হয় বাইরেটা দূরে সরে যাচ্ছে, কিংবা আমিই হটে আসছি।"

আমেদ বলল, "আশা আকাঙ্ক্ষায় চেহারাও বদলে গিয়েছে! এবং এই কদিনেই!"

শুভঙ্কর বলল, "না। অতটা হলপ করে বলতে পারব না। তবে আশা আকাঙ্ক্ষার টান ক্ষীণ হয়ে এসেছে।"

আমেদ বলল, "তার অর্থ নূতন আশা আকাঙ্ক্ষার এখন ভ্রূণ অবস্থা। জোর করে নষ্ট না করলে জন্ম অনিবার্য। অর্থাৎ তোমার ভিতর যে জগৎ একান্ত তোমার সেখানে তোমার পুনর্জন্মের আয়োজন চলছে।" একটু ভেবে আমেদ বলল, "যদি জোর করে নষ্ট করি, একটা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু একটা সম্ভাবনা নষ্ট হবে। তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় অধ্যায়টাই হয়তো অসমাপ্ত থাকবে।"

শুভঙ্কর বলল, "জোরেব উত্তরে ভিতরটা দ্বিগুণ জোরে সাড়া দিতে পারে।"

আমেদ বলল, "অসম্ভব নয়।"

স্যুপ এসে গিয়েছিল। শুভঙ্কর ও আমেদ প্রায় এক সঙ্গে স্যুপেব ডিশ্‌য়ে চামচে ডোবাল।

লাঞ্চ খেতে খেতে আমেদ শুভঙ্করেব মনের প্রতিক্রিয়া বুঝবার জন্য খুঁটিনাটি বিস্তর প্রশ্ন করল। কয়েকটা প্রশ্ন শুভঙ্করের বেশ অবান্তর ঠেকল। চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের জীবন যাত্রার যে বিষয়গুলি নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে নি, আমেদের প্রশ্নের খোঁচায় তার মনে নড়ে চড়ে উঠল। লাঞ্চের শেষে একসময়ে আমেদ বলল, "বোঝা দরকার বিপদের কেন্দ্র কোথায়। চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে না তোমার ভিতরে।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার থিওরিটা তুমি আমার ক্ষেত্রে খাটাতে চাইছ?"

আমেদ বলল, "সত্য নির্ণয়ের জন্য যে থিওরি মনে ধরবে, বিনা দ্বিরুক্তিতে খাটাতে হবে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি কিন্তু যখনই নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করছি, কাস্‌ল্‌টাকেই দেখতে পাচ্ছি। বলতে চাও সেটা আমার মনের কারসাজি ?"

আমেদ বলল, "হতে পারে। তবে সেখানে কাস্‌ল্‌ একেবারে সাক্ষীগোপাল নয়। তার বেশ হাত আছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমেদ। একটা নিদারুণ অস্বস্তি বোধ না করলে, আমার বর্তমান সমস্যা বিশেষ জটিল মনে না হলে তোমাকে চিঠি দিয়ে টেনে আনতাম না। তুমি ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো। আমার ভিতর দুটো শক্তি যেন একটা নির্মম দ্বৈরথের জন্য তৈরী হচ্ছে। আমার কল্যাণ অকল্যাণের যেন কোনো মূল্য নেই।"

আমেদ বলল, "দুটো শক্তি মহারানী ও অলকা চৌধুরী। আর একটা শক্তি যে কোনো মুহূর্তে এই দ্বৈরথকে জটিল করে তুলতে পারে।"

শুভঙ্কর বলল, "তুমি মৌনী তরুণীর কথা বলছ ?"

আমেদ ঘাড় নাড়ল।

শুভঙ্কর বলল, "তার কথা মাঝে মাঝেই মনে হয়। কিন্তু আমার অন্তর্দ্বন্দ্বে যেন তার কোনো ভূমিকা নেই।"

আমেদ বলল, "কেন নেই এই কথাটাই আমি বিশেষ করে ভাবছি।" লাঞ্চের শেষে টেবিল থেকে উঠতে উঠতে বলল, "চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের আগে তোমাকে বুঝতে চাই। সেজন্য আমার বিপদের যিনি উপলক্ষ্য সেই যক্ষিণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ঐ যক্ষিণী এমন একটি নারীরূপিণী রসায়ন, যার স্বল্প প্রয়োগে অত্যন্ত বর্ণচোরা মানুষেরও প্রকৃত বর্ণ ধরা পড়ে। ঠিকানা তো জানোই। তাড়াতাড়ি কাজ চুকিয়ে বিকেলে এসো। চা পানের সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে হাত দেওয়া যাবে।"

হোটেলের বিশাল বারান্দায় এসে আমেদ [illegible]বার শুভঙ্করকে শ্যেন দৃষ্টিতে দেখে নিল। শুভঙ্করকে শুধু চিন্তাকুল নয়, অসহায় মনে হচ্ছিল। আমেদ সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলল, "কুরুক্ষেত্রের চিরকাল এই এক রীতি। সময় বুঝে বৈকুবা এনে দেয়। ভয় নেই ঘোষ। মনে রেখো দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আর কলিতে জনাব আমেদ। চক্রান্ত কথাটায় চক্রের শেষ আছে, এ রকম একটা সন্দেহ জন্মে। সুতরাং আমি চক্রান্তের চেয়ে চক্রের পক্ষপাতী বেশী। আমার চক্র তোমার প্রয়োজনে ঘুরতে শুরু করল বলে। তোমার সমস্যা শাখা প্রশাখাসমেত ছিন্নভিন্ন হবে।"

বিকেল সওয়া পাঁচটায় শুভঙ্কর তার অফিসের গাড়িতে পুরোনো দিল্লীর সীমান্তে নিউ দিল্লীর গাঘেঁষা একটা চওড়া রাস্তা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা সরু সড়কে ঢুকল। বাড়িটা খুঁজে নিতে দেরী হল না। সম্মুখে গেটটা বাদ দিয়ে দেয়াল ও আধখানা বাড়ি ঢেকে লতাপাতার আচ্ছাদন। এই রকম বাড়ির নামের শেষাংশ কুঞ্জ বা মঞ্জিল না হলে মানায় না। শুভঙ্কর সবিস্ময়ে গেটে মার্বেল পাথরে খোদা নামটা পড়ল, রোশেনারা মঞ্জিল। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে আমেদ বারান্দায় বার হয়ে এসে বলল, "এসো এসো, ভাবছিলাম কাজে ডুবে গিয়ে ঘড়ি দেখতে ভুলে না যাও।"

আমেদ শুভঙ্করকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ডান ধারে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেল। সেকেলে বনেদী আসবাব। প্রতিটি আসবাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। জরাজীর্ণ নয়। একটা অলক্ষিত দ্যুতি যেন থেকে থেকে বিচ্ছুরিত হয়। ভাবুক মনকে স্পর্শ করে। মূল্যবোধ সম্বন্ধে সজাগ করে দেয়।

ঘরে ঢুকেই শুভঙ্করের মনে একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। অপরাহ্ণ-চায়ের উপযোগী নিখুঁত মঞ্চসজ্জা ও ব্যবস্থা। শুধু চা পানের নয়। অপরাহ্ণ-নাটকের সুসঙ্গত কোনো দৃশ্যের। শুভঙ্কর

বসতে না বসতেই ঘরের দরজার ভারী রেশমী পর্দা সরিয়ে একটি তরুণী ড্রয়িংরুমে ঢুকল। এ প্রবেশ সাধারণ নয়। নাটকীয়। কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

শুভঙ্কর উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমেদ শুভঙ্করকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে বলল, "আমাব বন্ধু ঘোষ। এর কথাই বলছিলাম।" শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, "এব কথা তোমাকে বলেছি। জাহানারা বেগম। সম্পর্কে বন্ধুস্ত্রী। আসলে আমার আশ্রয়দাত্রী।"

নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পর জাহানারা বেগম বলল, "এমনিতেই দেরী হযেছে। চা দিতে বলি। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।"

শুভঙ্কব একটা অদ্ভুত উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় চা-পানেব আবহ নাটকের জন্য তৈরী হয়ে নিল। জাহানারা বেগমেব ভ্রুভঙ্গে কটাক্ষে শুধু নয়, নিশ্বাসে প্রশ্বাসেও যেন নাটক। নাটকের উপাদানে যেন সে তৈরী। জীবনের যে ভূমিকায়ই তাকে কল্পনা কবা যাক, তাকে নাটক থেকে আলাদা কবে দেখা যায় না। সে যেন মূর্তিমতী একটি জীবন নাটিকা। শুভঙ্কব এক নূতন বিস্ময়ে ভাবে এই নাটিকায় কী তৃপ্তি, কী ব্যর্থতা! কত হাহাকাব! কত উল্লাস! নাবীদেহেব অর্থ কত জটিল, ইঙ্গিত কত মাবাত্মক হতে পাবে জাহানাবাকে দেখে শুভঙ্কব যেন প্রথম পুরোপুবি বুঝতে পারে।

চা-র সবঞ্জাম এসে গেল। জাহানারা বলল, "আপনি অতিথি, আগে আপনাকে এক কাপ তৈরী করে দিই।"

শুভঙ্কর মুগ্ধদৃষ্টিতে জাহানাবার চা তৈরীব খণ্ড দৃশ্য দেখল। তাব ডান হাতের চম্পক অঙ্গুলিব ও চা-র পট ও পেয়ালার ভিতর যেন এক অন্তবঙ্গ সংলাপ চলেছে। বাঁ হাতে মাঝে মাঝে সে তার অর্ধাবগুণ্ঠন ঠিক করে নিচ্ছে। চা-র কাপ শুভঙ্করের হাতে তুলে দেবার সময় জাহানারা হাসল। শুভঙ্করের মনে হল ট্রয়ের আগুন যেন নিউ দিল্লীতে মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল।

আমেদ শুভঙ্করের তন্ময় ভাব লক্ষ্য করছিল। পরিহাসচ্ছলে বলল, "জাহানারা, তুমি পরীক্ষায় পাস করেছ। ঘোষ আকৃষ্ট।"

আমেদের রসিকতা মাত্রা ছাড়িয়ে এতদূর যেতে পারে শুভঙ্কর ভাবতে পারে নি। সে তৎক্ষণাৎ জাহানারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় রাগত স্বরেই বলল, "আর ইউ ম্যাড্?"

জাহানারা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। বলল, "আমি কি এতই হতশ্রী যে একটি রুচিবান যুবককে আকর্ষণ করতে পারি না।"

শুভঙ্কর বিশেষ অপ্রস্তুত বোধ করল। বলল, "হ্যাঁ। না—অর্থাৎ।"

আমেদ বলল, "ঘোষ। জাহানারাকে দেখে সকলেই আকৃষ্ট হয়। তুমি এ বিষয়ে একা নও এবং কোনো অপরাধ কর নি। আকর্ষণ যেখানে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বীকৃত সেখানে তাকে অস্বীকার করা প্রতারণার সামিল।"

জাহানারা কটাক্ষ হেনে বলল, "অবশ্য নিখুঁত সুন্দরী কে হতে পারে। আমার চেহারায় নিশ্চয়ই এমন কোনো ত্রুটি আছে যা আর সকলের নজর এড়িয়ে গেলেও মিস্টার ঘোষের চোখে ধরা পড়েছে।"

শুভঙ্কর এবার জাহানারার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভুল বুঝবেন না। আমার চোখে কোনো ত্রুটিই ধরা পড়ছে না।" তারপর আমেদের উদ্দেশে বলল, "তোমার কথাটার একটা ভুল অর্থ ধরেছিলাম।"

আমেদ বলল, "ফলে এখন কথার কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছ।"

জাহানারা বলল, "বেশ। নিখুঁত সুন্দরীর হাতে তৈরী আর এক পেয়ালা চা-যে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "না।"

আমেদ বলল, "আমি?"

জাহানারা বলল, "তুমি দূর হও।"

আমেদ সোফা থেকে উঠে পড়ল। জাহানারাকে বলল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ঐ মধুর শব্দ উচ্চারণ না করলে কেলেঙ্কারী হত। একটা জরুরী এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ আগে থেকে করে রেখেছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার কথায় মনে পড়ল।" হাতঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, "জাহানারা, তোমার আকর্ষণের জোরে ঘোষকে ঘণ্টাখানেক ধরে রাখতে পারো তো বাহাদুরী বুঝবো।" শুভঙ্করকে বলল, "ঘোষ! বিশেষ আপত্তি না থাকে তো ঘণ্টাখানেক জাহানারাকে সঙ্গ দাও। তার ভিতরই ফিরব।"

শুভঙ্করের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমেদ দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

আমেদ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুভঙ্কর ঘরে একটা বিশেষ উত্তাপ বোধ করল। এই উত্তাপ ধীরে ধীরে তার ভিতরে ঢুকে তার রক্তস্রোত তাতিয়ে তুলল। শুভঙ্কর তার সোফায় একটু নড়ে চড়ে বসল। সৃষ্টিলীলায় প্রকৃতি কি এভাবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন? জলে বাতাসে মনের মতো নরম করে তপ্ত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যান? ফুল ও ফল, পশু পক্ষী বিনা আপত্তিতে প্রকৃতির সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কেবল মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির জোরে কিংবা অহঙ্কারে প্রকৃতির সিদ্ধান্তে আঁচড় কাটার চেষ্টা করে। যে-মানুষ মানুষের খোলসে পশুর ভিন্ন সংস্করণ তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে-মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে স্মরণাতীত কোনো মুহূর্তে মানুষ জাতের একটা বিশেষ চুক্তির উপর, এবং সেই চুক্তির জোরে তার ঐশ্বরিক দাবীর উপর, স্মৃতিতে না হোক অনুভূতির স্তরে জোর না দিয়ে পারে না, সে, পরিণাম যাই হোক, প্রকৃতির সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে চায় না। মেনে নিলে সে কোনো একটা বড় হিসেবে খাটো হয়ে যায়। এই খাটো হবার গ্লানি জীবনের কোনো আনন্দ দিয়ে সে ঢাকতে পারে না।

জাহানারা বলল, "আমেদ গিয়েছে, ভালো হয়েছে।" শুভঙ্কর

কোনো প্রশ্ন করার আগেই বলল, "ও কথার জাহাজ। ও থাকলে আর কারো মুখ খোলা হয়ে ওঠে না।" তারপর সোফায় একটু এলিয়ে বসে বলল, "আপনি আমেদের টিপ্পনি পছন্দ করেন নি?"

শুভঙ্কর নীরবে জাহানারাকে লক্ষ্য করল।

জাহানারা বলল, "আমি হলে কিন্তু মোটেই ধরা পড়ে গিয়েছি, এ রকম ভাব দেখাতাম না। বলতাম, আকৃষ্ট হয়েছি বেশ করেছি।"

শুভঙ্কর হাসল। এ হাসি সতর্কতার মুখোশ।

জাহানারা শুভঙ্করকে দেখতে দেখতে বলল, "আমি কিন্তু বিশেষ আকৃষ্ট। মনস্থির করতে সময় লাগে নি। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে।"

শুভঙ্কব বলল, "আমি কিন্তু হয়েও না হবার চেষ্টা করছি।"

জাহানারা বলল, "কেন? আমার অপরাধ?"

শুভঙ্কর বলল, "অপরাধ আমার। ভিতরে কোথাও খোঁচা খাচ্ছি। ভয় হচ্ছে আমেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছি।"

জাহানারা বলল, "আসক্তির ভয় থাকলে ও কথা বলতে পারতেন। আকৃষ্ট হওয়া আর আসক্ত হওয়া ঠিক এক জিনিস নয়।" কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও শুভঙ্করকে নীরব দেখে জাহানারা বলল, "আকর্ষণ অবশ্য আসক্তির আগের ধাপ। তবে নানা ছুতোয় থেমে যাওয়া যায়। কখনো কখনো আবার এগোতে গেলে বাধা পেয়ে পিছু হটতে হয়। আপনি হয়তো ছুতোর চেয়ে বাধার কথাই বেশী ভাবছেন?"

শুভঙ্কর বলল, "ভেবেছিলাম। এখন আর ভাবছি না। মেনে নিয়েছি।"

জাহানারা বলল, "কেন? জানতে পারি?"

শুভঙ্কর বলল, "কারণ এক্ষেত্রে বাধা আমেদ।"

জাহানারা বক্রদৃষ্টি হেনে বলল, "আপনার উপকারী বন্ধু আমেদ।"

শুভঙ্কর নীরবে এই পরিহাস হজম করল।

জাহানারা বলল, "যদি বাধা না থাকতো? অন্ততঃ আমেদ না থাকতো?"

শুভঙ্কর সকাতরে বলল, "আপনি আমাকে নিয়ে পরিহাস করবেন না, এ পরিহাস আপনাকে মানায় না।"

জাহানারা বলল, "আমার কথায় একরতি পরিহাস নেই। আপনি ভীরু। মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে চান।"

শুভঙ্কর আহতস্বরে বলল, "আমি ভীরু নই, বিপন্ন। আমার অবস্থা জানলে এ কথা বলতেন না।"

জাহানারা বলল, "না জানালে কী করে জানবো! অবশ্য বলতে পারেন ঘণ্টাখানেকের পরিচয় মন মেলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

শুভঙ্কব বলল, "ঠিক তা নয়। আসল কথা আমি নিজেই নিজেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। নিজের সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলার শক্তিই আমার নেই।"

জাহানাবা হেসে বলল, "সুতরাং শক্তি ও অভয় দিতে মাদ্রাজ থেকে কলির অবতার আমেদের নিউ দিল্লীতে আগমন।"

শুভঙ্কর নিশ্চল নিস্তব্ধ। তার দৃষ্টি উদাসীন, লক্ষ্যহীন।

জাহানারা বলল, "আপনাদের শাস্ত্রে শুনেছি নারীকে শক্তিরূপিনী বলা হয়। নারীকে শুধু অপচয়ের খেলায় সঙ্গিনী মনে করেন কেন?"

শুভঙ্কর বলল, "সে নারীর দেখা আজ পর্যন্ত পাই নি।"

জাহানারা তীব্রস্বরে বলল, "পান নি? প্রমাণ পেতে চান?"

শুভঙ্কর কেঁপে উঠল। সে বিস্ময়ে অবিশ্বাসে জাহানারার নূতন মূর্তি দেখল। জাহানারা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি। চোখে কোটি কোটি বর্ষের দুর্বোধ্য আহ্বান। শুভঙ্করের চোখে পলক পড়ল না। ভয়ে বিস্ময়ে সংশয়ে আশঙ্কায় সে বার বার শতধা

হল। তার স্মৃতিধৃত মহাকাব্য ও ইতিহাসের অসংখ্য ভূমিকায় সে নিজেকে দেখল। অতীতের নানা পথে নানা রথে অসংখ্য অভিযান ও অভিসারের শেষে সে তার বর্তমানে ফিরে এল।

জাহানারা এগোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখভাব স্বাভাবিক হয়ে এল। ফিসফাস করে বলল, "গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছি। আমেদ আগেই ফিরল।" তারপব শুভঙ্করকে সুগভীর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, "কপাট খোলা রইল। আসবেন। চান তো টেলিফোন করবেন।"

সেদিন আমেদ ফেরার কিছু পবই শুভঙ্কর বিদায় নিয়েছিল। আমেদকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। জাহানারা অধ্যায় নিশ্চয়ই তার কারণ নয়। কেন না ব্যাপারটা চুকে গিয়ে আমেদ ড্রয়িং রুমে ঢুকবার আগেই চা-পার্টিব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল। পরদিন শুভঙ্কব অফিসে এগারোটা নাগাদ লোক মারফৎ আমেদের একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি পেল। বক্তব্য : তোমাব ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ নয়। কিন্তু হাল ছাড়ছি না। তবে রহস্য সমুদ্রে ডুব দিতে হচ্ছে। দিন কয়েক নিখোঁজ হতে পারি। দুশ্চিন্তা কোরো না। কাউকে এড়াতে যেয়ো না। সতর্ক হতে গিয়ে শামুক হবার চেষ্টা কোরো না। ঘটনা যত বেশী ঘটে ততই ভালো। ঘটনার ভিতরই তোমার বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

সাহসে বুক বেঁধে শুভঙ্কর ঘটনার অপেক্ষায় রইল। নিউ দিল্লী, এমন কি চৌধুরী কাস্‌ল্‌ও হঠাৎ নিতান্ত নির্লিপ্ত হয়ে পড়ল। কোনো ঘটনাই ঘটল না। কোনো দিক থেকেই কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অফিসের টেলিফোনটা পর্যন্ত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করল। যেদিন আমেদের চিঠি এল সেদিনে তো বটেই, পরদিনও সন্ধ্যা অবধি শুভঙ্করের সঙ্গে তার পৃথিবীর অসহযোগ চলল। সুতরাং কাস্‌ল্‌য়ে

ফেরার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে বিক্রম শার আহ্বান পেয়ে ক্লান্তি সত্ত্বেও সে সাগ্রহে সাড়া দিল।

সদাব্যস্ত বিক্রম শা ম্লানমুখে চুপচাপ বসেছিলেন।

শুভঙ্কর ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, "ব্যাপার কী? কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন বোধ হচ্ছে।"

বিক্রম শা প্রত্যুত্তরে বললেন, "একটা অন্যরকমের ছুটির কথা ভাবছি।" তাঁর বিরস হাসি তাঁর মুখকে আরো ম্লান করে তুলল। বললেন, "সে যা হোক, একটা জরুরী আলোচনা আছে। বিশ পঁচিশ মিনিট সময় হবে?"

শুভঙ্করের সম্মতি পেয়ে বিক্রম শা উঠে সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "আমার একটা অনুরোধ আছে।" একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "অনুরোধ রক্ষা করেন তো বলি।"

শুভঙ্কর বলল, "উচিত অনুরোধ হলে নিশ্চয়ই রাখবো।"

বিক্রম শা বললেন, "অনুরোধ এই, আমি আপনাকে একটা সৎপরামর্শ দিতে চাই। পরামর্শ মতো কাজ করবেন কি না একান্ত আপনার অভিরুচি। কিন্তু কোনোক্রমে কোনো কারণেই, কারণ যত গুরুতরই হোক, পরামর্শ আমার কাছ থেকে পেয়েছেন কাউকে জানাবেন না।"

শুভঙ্কর বলল, "মহারানীকেও নয়?"

বিক্রম শার মুখ বিবর্ণ হল। বললেন, "বিশেষ করে।"

শুভঙ্কর একটু ভেবে নিয়ে বলল, "বলুন।"

বিক্রম শা বললেন, "মিস্টার ঘোষ! আপনি যে কোনো ছুতোয় অবিলম্বে চৌধুরী কাস্‌ল্ ত্যাগ করুন।"

শুভঙ্কর বিস্মিত হল এবং হল না। এই কদিনে বিস্ময়ের সঙ্গে শোয়াবসার ফলে এ মনোভাব অস্বাভাবিক নয়।

বিক্রম শা বললেন, "কদিন আগে বলতে গেলে আমিই আপনাকে

জোরজবরদস্তি করে এখানে এনেছিলাম। এখন আমিই সরে পড়তে বলছি। কোনো গুরুতর কারণ দেখাতে না পারলে আমার আচরণ অত্যন্ত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক ঠেকবে।"

শুভঙ্কর ঘাড় নাড়ল।

বিক্রম শা বললেন, "যেহেতু সুস্থ মস্তিষ্কে এই পরামর্শ দিচ্ছি, একটা বিশেষ জরুরী কারণ না থেকে যায় না। মুশকিল এই, কারণটা কোনো ক্রমেই খুলে বলা চলে না।"

শুভঙ্কর বলল, "খুলে না বললেও কেন যেতে বলছেন আভাসে ইঙ্গিতে তো বোঝাতে পারেন!"

বিক্রম শা কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিলেন না। পরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "না। বোঝাতে পারি না। আমি এখনও এই এস্টেটের ম্যানেজার। তা ছাড়া ব্যাপারটা আমি যে নিজেও পরিষ্কার বুঝেছি, বলতে পারি না।"

শুভঙ্কর বলল, "পরিষ্কার বোঝেন নি। কিন্তু বিপদের নিশানা দেখছেন!"

বিক্রম শা বললেন, "বিপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।"

শুভঙ্কর বলল, "আমিও।"

বিক্রম শার কৌতূহল মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, "কবে থেকে?"

শুভঙ্কর বলল, "যেদিন আপনি চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের হয়ে আমাকে অতিথি মহলের নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন।"

বিক্রম শা বললেন, "বিপদ ও রহস্য এক বস্তু নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "জানি। এখন আপনার বিপদের কথা বলুন। আপনি কবে টের পেলেন? কোথায় টের পেলেন?"

বিক্রম শা বললেন, "কয়েকদিন আগে।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "আমি আসবার আগে না পরে?"

বিক্রম শা বললেন, "পরে।"

শুভঙ্কর অবিশ্বাসে হাসল। বলল, "পরে ?"

বিক্রম শা বললেন, "বিশ্বাস করুন।"

শুভঙ্কর বলল, "এই সুরক্ষিত কাস্‌ল্‌য়ে বসে হঠাৎ একদিন বিপদের নিশানা দেখেছেন। আপনার বাহাদুরিব তারিফ না করে পারছি না মিস্টার শা।"

বিক্রম শা জবাবে বললেন, "কাস্‌ল্‌য়ে বসে এতকাল রহস্যের নিশানাই দেখেছি। কিন্তু রহস্যের আড়ালে বিপদও আছে ধারণা ছিল না। প্রথম টের পেলাম কয়েকদিন আগে। এবং কাস্‌ল্‌য়ে বসে নয়।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় ?"

বিক্রম শা বললেন, "মহারানীর ভগ্নী মিস চৌধুরীর ক্লাবে।"

শুভঙ্কর চমকে উঠল। অর্ধস্ফুট স্বরে বলল, "মিস চৌধুরীর ক্লাবে ?"

বিক্রম শা বললেন, "হ্যাঁ। তবে আমি শারীরিক বিপদের কথা বলছি না। ব্রিগেডিয়ার বিক্রম শা দেহ রক্ষায় অপটু নয়।"

শুভঙ্কর মনের উদ্বেল উদ্বেগ চাপা দেবার চেষ্টা করে বলল, "তা হলে ভয়ের কী আছে মিস্টার শা ?"

বিক্রম শা বললেন, "ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। তবু আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই। জানি না ফল হবে কি না।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "কার সম্বন্ধে ? মহারানীর ? মৌনী তরুণীর ?"

বিক্রম শা বললেন, "না। মানুষ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া চলে। কিন্তু মানুষ যাদের হাতের মুঠোয়, তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া কঠিন।"

শুভঙ্কর কোনো কথা বলল না।

বিক্রম শা গলা নামিয়ে বললেন, "প্রাণীর চেয়েও অনেক বেশী প্রবল হচ্ছে তার প্রবৃত্তি ও সংস্কার। কখনো কখনো নিগূঢ় কারণে এদের শক্তি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কাস্‌ল্‌য়ে কিছুকাল ধরে এই রকম

একটা অদৃশ্য শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।"

শুভঙ্কর বলল, "কাকে? আপনাকে না আমাকে?"

বিক্রম শা জবাব দিলেন, "আমাকে তো বটেই। হয়তো আপনাকেও।"

শুভঙ্কর হেসে জিজ্ঞাসা করল, "মহারানীকেও?"

বিক্রম শা গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে বললেন, "হয়তো তাঁকেও।" কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "আমি ছিলাম যোদ্ধা। আমার শাদাকালোর জগতে সোজা হিসেবে পাপেপুণ্যে বেশ ছিলাম। প্রাণ দিয়ে দেশরক্ষা করতে দ্বিধা হয় নি। বহুবার জখম হয়েছি। কিন্তু যেখানে দেশপ্রেমের প্রশ্ন নেই, নারীকে সকল শুচিতার দুর্গ থেকে টেনে বার করেছি। মনে কোনো বাধা পাই নি। আজকাল নারীর ক্ষেত্রে মনে নানা প্রশ্ন ওঠে। প্রবৃত্তি সম্মুখে ঠেলে দেয়। পিছন থেকে সংস্কার দংশন করে। বিষ ঢেলে দেয়।" একটু থেমে দম নিয়ে বিক্রম শা বললেন, "কয়েকদিন আগে মিস চৌধুরীর ক্লাবে টের পেয়েছি, পরে স্পষ্ট বুঝেছি, চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে আমার আত্মা বিপন্ন। হয়তো আপনারও। যিনি না জেনে বুঝে জড়িত, হয়তো সেই মিস চৌধুরীরও।"

শুভঙ্কর বলল, "যে বিপদে মিস চৌধুরী এবং ওরই মতো আর কেউ জড়িত তাতে জড়াতে কে না চায়! আমার বিপদ, আমি বিপদ কেন, কোনো কিছুতেই জড়াতে পারি না। তাশৈশব গিঁট খুলে বার হয়ে আসার অভ্যেস। সুতরাং মিস্টার শা আমি এই কাস্‌ল্‌য়ের নিরাপদ আশ্রয়ে বিপদের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

বিক্রম শার মুখের রক্ত কে শুষে নিল। তাঁকে দেখতে একটা মড়ার মতো মনে হল।

শুভঙ্কর মুখে ওকথা বলল বটে, কিন্তু তার ভিতর দুর্নিবার কৌতূহল ও সীমাতীত ভয়ের একটা অস্পষ্ট অথচ প্রবল অনুভূতি ক্রমশ

একটা বিশেষ আকার নিতে থাকল। তার ভিতর সে কখনো চৌধুরী কাস্‌ল্‌, কখনো আর একটি বিশেষ মানুষকে দেখল। এই মানুষটি মহারানী?

শুভঙ্কর চলে যাবার পরও বিক্রম শা টেবিলে চিত্রার্পিতের মতো বসে রইলেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর ভবিষ্যতের অন্ধকার দিগন্ত। একাধিক ক্ষীণ সর্পিল রেখা। কোনটা পথ কোনটা মরীচিকা বোঝা দুঃসাধ্য। যাত্রাশেষের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। নির্মম আঘাতের ক্রূর ছলনার অসংখ্য ইঙ্গিত। তাঁর জীবনের কঠিনতম সমস্যার সম্মুখে বিক্রম শা হতবুদ্ধি, নির্বাক, সংশয়জর্জর, প্রশ্নকাতর।

ক্লাবে অলকা চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত অধ্যায় দুর্ভাগ্যের বিস্ফোরণের মতো অকস্মাৎ শুরু হয়। অলকা চৌধুরী ও বিক্রম শা উভয়েই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে পরস্পরকে লক্ষ্য করেছিলেন। অলকা চৌধুরীর মুখের পেশী কঠিন হবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম শার হৃদয়ও পাষাণের মতো নিরেট ভারী হয়ে এল।

বিক্রম শা অত্যন্ত অস্থির বোধ করলেন। কাস্‌ল্‌য়ে সোজা ফিরে আসতে বাধা পেলেন। নিউ দিল্লীর স্বাধীনতা তোরণের খানিকটা তফাতে গাড়ি বেঁধে রেখে লক্ষ্যহীনের মতো অনেকক্ষণ হাঁটলেন। কিন্তু মনের ভার লাঘব হল না। অস্থিরতা বেড়েই চলল।

বিক্রম শা বীরবংশের সন্তান। কয়েক পুরুষ ধরে তাঁর পিতৃকুল মিলিটারী সার্ভিসে যে খ্যাতি অর্জন করেছিল বিক্রম শা রণশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যে, সাহসে ও বুদ্ধিতে তা ষোলো আনা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু প্রথম যৌবনেই নির্মম প্রতারণায় তাঁর জীবনে যে একটা ফাটল ধরেছিল, তা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কোনো আপীলই যখন টিকল না, নিষ্ফল আক্রোশে এই ফাটলে আঘাত করে করে তিনি প্রতিকূল ঘটনার ও অভিজ্ঞতার পথ

প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কখনো ভুলতে পারেন নি তিনি শা কুলের উজ্জ্বল রত্ন বিখ্যাত ব্রিগেডিয়ার বিক্রম শা। অসম্মান অবহেলার সঙ্গে রফা করতে পারেন নি। তাঁর ভিতরে রক্তস্রোত যখন খরগতি হয়ে পড়ত, বিক্রম শা উপযুক্ত মূল্যে নারীসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করতেন। কিন্তু ইজ্জত পুরোপুরি বজায় রেখে। পেশাদারী অপেশাদারী কোনো নারীই তাঁর সম্মানবোধে আঘাত দিতে সাহস পায় নি। তাঁর দুর্বলতম মুহূর্তেও তিনি আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন।

চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়েও বিক্রম শা সসম্মানে চাকরিতে বহাল ছিলেন। তিনি কৌশলী ও বিচক্ষণ ছিলেন। বৈষয়িক নানা ব্যাপারে তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মাখনেব তালে ইস্পাতের শাণিত ফলার মতো কেটে বসত। মহারানী প্রথম কিছুকাল অন্দর মহল থেকে তাঁর উপর কড়া নজব রেখেছিলেন। কিন্তু অল্পসময়ের ভিতবই বিক্রম শা মহাবানীব আস্থা অর্জন কবেছিলেন। মহারানী এস্টেটের ও কাস্‌ল্‌য়েব ভার পরম নির্ভয়ে তাঁর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শৌখিন বিক্রম শা চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্যে জৈবিক স্বাচ্ছন্দ্যেব দিক দিয়ে সুখে ছিলেন। কিন্তু তাঁব জীবনে একটি দীর্ঘশ্বাস তাঁর রক্তস্রোতে মিশে গিয়ে তাঁকে চঞ্চল কবে তুলত। এ দীঘশ্বাস নারীর জন্য। একটি করুণাব্রূপিনী গভীরাক্ষী নারীর জন্য, যে নারী হৃদয়ের ভাষা পড়তে জানে, যে বিশ্বাসেব মূল্য দিতে পাবে। বীব বিক্রম শার পিতৃকুলের ইতিহাস নিহত সংসারের আহত আত্মাব ইতিহাস, স্বৈরাচারেব ইতিহাস। এ ইতিহাসেব মুখ্য চবিত্র স্বৈরাচারী নয়, স্বৈবাচাবিণী।

বিলাসিনীদের সঙ্গ বিক্রম শার জীবনেব ট্র্যাজেডিকে নির্মমতর করে তুলেছিল। চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে মৈনী তরুণীকে আশ্রয় করে তিনি একটা অন্তরঙ্গ জগত তৈরী করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুভঙ্কব ঘোষ একটুকরো কাগজেব ছোঁয়ায় তাঁর সেই জগতটা চুরমার

করে দিয়েছিল। মৌনী তরুণীর চিঠিতে মহারানীর হস্তাক্ষর দেখে বিক্রম শা চমকে উঠেছিলেন। মৌনী তরুণী দুরধিগম্যা, এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না। কী করে তার দিকে হাত বাড়াবেন ভেবে বিক্রম শা সোজা পথ খুঁজে পেতেন না। কিন্তু সে যদি মহারানীর নামান্তর হয়, তা হলে এ জীবনে বিক্রম শার কাছে সে চিরদিনের জন্য অগম্যা থেকে যাবে। যখন বিক্রম শা নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন অলকা চৌধুরীর আহ্বান এল। ফলে অলকা চৌধুরী যখন ক্লাবে ডেকে পাঠিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আসক্তির ইঙ্গিত দিল, বিক্রম শা বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তৃপ্তি কাকে বলে, শান্তি কাকে বলে সেই যেন প্রথম তিনি জানলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, সেই তৃপ্তি ও শান্তির অনুভূতি দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দাম রক্তবন্যায় বাঁধ দিতে পারলেন না। এ প্লাবন হঠাৎ এল। দুরন্ত টানে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। পদস্খলন হল। অলকা চৌধুরী তাঁকে ভুল বুঝলো।

বিক্রম শার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। একটা নতুন চিন্তা একটা নতুন সন্দেহ সৃষ্টি করল। অলকা চৌধুরীর আসক্তি কতটা সত্য? কতটা অভিনয়? যদি অভিনয় হয়, সম্পূর্ণ অভিনয় হতে বাধা কী? কারণ কত অনিবার্য হলে অলকা চৌধুরীর পক্ষে এই রকম অভিনয়ের প্রয়োজন হতে পারে? যে অভিনয় গোড়া থেকে শেষ অবিমিশ্র প্রতারণা!

বিক্রম শা-র অন্তর্জগতে অকস্মাৎ ঋতু পরিবর্তন হয়। এক অশুভ আশঙ্কা হিমপ্রবাহের মতো চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে চঞ্চল তপ্ত রক্তস্রোত জমে বরফ হতে থাকে। চৌধুরী কাস্‌ল্ ও তার মানুষগুলির একটা ভিন্ন রূপ দেখে তিনি চমকে ওঠেন। তাঁরই আমলে চৌধুরী কাস্‌লয়ের এলাকায় তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে সম্মুখ দৃশ্যের আড়ালে কোন্ পশ্চাৎদৃশ্যের আয়োজন হচ্ছে? অতিথি মহলের শৌখিন প্রহসনের ছদ্মবেশে কোন্ রেষারেষি ও হানাহানির

পালার মহলা চলছে ? কে কোন্ ভূমিকায় ? কতটা জ্ঞাতসারে ?

বিক্রম শা কাস্‌ল্‌য়ে ফিরে আসতে আসতেই তাঁর প্রথম কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। শুভঙ্কর ঘোষকে মহারানীর নির্দেশে তিনিই অতিথি মহলে এনেছিলেন। তাকে যেনতেন প্রকারেণ অতিথি মহল থেকে সরানো। শুভঙ্কর ঘোষ সম্বন্ধে বিক্রম শা প্রথম থেকেই একটা অদ্ভুত দুর্বলতা বোধ করতে শুরু করেছিলেন। শুভঙ্কব তাঁকে তফাতে রাখতে চাইত, তার আচরণে তিনি বুঝতে পাবতেন। তা সত্ত্বেও শুভঙ্করের প্রতি তাঁর মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় নি। তার জন্য তিনি তাঁর মনের একটা কপাট সবদা খুলে বেখেছিলেন। শুভঙ্কর কখনো সখনো কোনো কারণে অফিসে এলে তার মনটা হালকা ঠেকত। কাস্‌ল্‌য়ের সুগন্ধি চায়ে নূতন স্বাদ পেতেন।

শুভঙ্করকে পথে আনতে না পেরে বিক্রম শার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। তার কোনো ক্ষতি হতে দেওয়া চলবে না। সেজন্য পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু—মনে একটা ধাক্কা খেয়ে বিক্রম শা টলতে টলতে সামলে নিলেন। শুভঙ্কব কি শুধু বিনা ব্যয়ে শৌখিন জীবনের লোভে, কিংবা তাঁকে তাচ্ছিল্য করার অভ্যাসে অতিথি মহল আঁকড়ে থাকতে চাইছে ? যদি তা না হয়, তাহলে তার একগুয়েমীর অর্থ কী ? কে তাকে টেনে রাখছে ? মহাবানী ? অলকা চৌধুরী ? মৌনী তরুণী ? না সে নিজে ?

মহারানী! কাস্‌ল্‌য়ে মহারানী নিজেকে অন্দরে নির্বাসন দিয়েছেন। প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। কেন ? এই কেনর উত্তর বিক্রম শা পান নি। প্রখর বুদ্ধিব অধিকারিনী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না তরুণী মহারানী কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিংবা সকলের অলক্ষ্যে জীবনের কোন্‌খানে হাত বাড়িয়েছেন, বিক্রম শা বোঝার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু আজ হঠাৎ তিনি একটা বিষয় বুঝবার জন্য অধীর হলেন। মহারানী অতিথি মহলে শুভঙ্করকে পাবার জন্য কেন এত আগ্রহ দেখালেন ? আগের তিন অতিথির কারো সঙ্গেই শুভঙ্করের মিল

নেই। কারো সমপর্যায়ের সে নয়। মহারানীর মতো তাঁরাও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সত্য বা মীমাংসা অন্বেষণ করছিলেন। তাঁরা যে যাঁর ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুভঙ্কর সম্বন্ধে এরকম কোনো কথাই বলা চলে না। কিন্তু তবু মহারানীর এই প্রচণ্ড আগ্রহ কেন? অন্য কোন কারণে? না বারবার তিনবার অসাধারণ পুরুষদের অসম্পূর্ণতার প্রমাণ পেয়ে সাধারণকে সম্পূর্ণ অসাধারণ করে তোলার নেশায়? এই প্রয়াস কি কিছুটা সফল হয়েছে? এতে কি অলকা চৌধুরীর আপত্তি? অসাধারণত্বের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণকে তার নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ায়? অর্থাৎ, বিক্রম শা যুক্তির ধাপে ধাপে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান। নিজেকে প্রশ্ন করেন, অলকা চৌধুরী কি শুভঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট? অতিথি মহলের বর্তমান পালার নায়ক কি শুভঙ্কর ঘোষ? শুধু অতিথি নয়, নায়ক?

বিক্রম শার চিন্তাজাল ছিন্ন করে টেলিফোন বেজে উঠল। হাতঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। এতক্ষণ তিনি একনাগাড়ে চিন্তা করেছেন খেয়াল ছিল না। টেলিফোনটা বেজে চলেছে। এতরাতে কে টেলিফোন করে ভাবতে ভাবতে বিক্রম শা রিসিভার তুললেন।

বিক্রম শা বিস্মিত হলেন। অলকা চৌধুরীর গলা। "মিস্টার শা?"

"হ্যাঁ। মিস চৌধুরী?"

"এতরাতে আপনাকে পাবো আশা করি নি।"

বিক্রম শা নীরব।

"জরুরী কোনো কাজে ব্যস্ত বুঝি?"

"না। না। এমনিই বসে ছিলাম।"

"এমনিই? টেবিলটা একদম খালি? কাগজপত্রের কথা বাদ দিন। কোনো কিছুই নেই?" অলকা চৌধুরী খিলখিল করে

হাসল। বিক্রম শার কানে সেই হাসি হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়া জীবনের জেগে ওঠার প্রথম কলকাকলীর মতো বাজল। বিক্রম শা সাড়া দিতে গিয়ে কী ভেবে নিরস্ত হলেন।

বিক্রম শা সহজ স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, "আমার সুরাপান এখনো ব্যক্তিগত সাধারণ ঘটনা। ইতিহাস কিংবা কিংবদন্তীর স্তরে পৌঁছয় নি।"

"আই অ্যাম্ রিয়্যালি ভেরী সরি। আমি তামাশা করতে গিয়ে আপনাকে আঘাত করে বসেছি।"

বিক্রম শা পুনর্বার নিরুত্তর।

"মিস্টার শা!"

"বলুন।"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।"

"ও কথা থাক মিস চৌধুরী।"

"থাকবে কেন? আমি যতই ভেবে দেখছি, বুঝতে পারছি। মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

"আপনি ভুলবার চেষ্টা করুন।" বিক্রম শার গলা কি একটু কেঁপে গেল?

"কেন ভুলতে বলছেন?"

"ভুলতে পারবেন না এ রকম অহঙ্কার বা দাবী আমার নেই।"

"কী আশ্চর্য!" অলকা চৌধুরীর কণ্ঠে উষ্মা, অভিমান না অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারিকুরি?

বিক্রম শা জবাব দিলেন না। কিন্তু রিসিভারটা কান থেকে সরালেন না।

"ভুলতে পারি কি না পারি তার বিচার আমিই করব। আপনি আমাদের এস্টেটের ম্যানেজার বলে কি আমার মনেরও ম্যানেজারী করতে চান?"

"সে স্পর্ধা নেই। কখনো ছিল না।"

"ভাবী ক্রিয়াটাকে বাদ দিলেন কেন? ভবিষ্যৎকে ভয় পান?"

অতিদুঃখে বিক্রম শা হাসলেন। টেলিফোনের অপর প্রান্তে অলকা চৌধুরী ওষ্ঠদংশন করল।

"আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন মিস্টার শা।" অলকা চৌধুরীর গলায় নূতন সুর বাজল।

বিক্রম শা বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই জরুরী দরকারে টেলিফোন করেছেন মিস চৌধুরী।"

অলকা চৌধুরী নীরব।

বিক্রম শা বললেন, "অতিথি মহলের মৌনী তরুণীর বিষয়টা ভুলি নি। আমার কথার নড়চড় হবে না। যথাসময়ে টেলিফোনে কিংবা সাক্ষাৎমতো যোগাযোগ করব।"

"যোগাযোগ? এখনই করুন না?"

"এখন? এখনো তো ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি মিস চৌধুরী!"

"তাতে কি! কাজের প্রয়োজন ছাড়া কি যোগাযোগ অসম্ভব?"

বিক্রম শা জবাব দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না।

"আসবেন?"

"এত রাতে? কাস্‌ল্‌য়ের নিয়ম ভেঙে?"

"আমি আসবো?"

বিক্রম শা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "না মিস চৌধুরী। এত রাতে হস্টেল ছেড়ে কাস্‌ল্‌য়ে এলে ব্যাপারটা গোপন থাকবে না। মহারানীর কানে যেতে বাধ্য।"

"তা হলে থাক। টেলিফোন কেটে দেবেন না।"

গভীর বিস্ময়ে বিক্রম শা টেলিফোনের রিসিভার কানে রেখে বসে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা এক মিনিট না দু-মিনিট পথ অতিক্রম করল বলা দুরূহ। টেলিফোনের তার আবার মুখর হল। বিক্রম শার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার একটা দীর্ঘ যুগের পর।

অলকা চৌধুরী বলল, "আমি মিলিটারীর লোক নই। কুইক মার্চের নামে ভয় পাই। সেদিন আপনার কাছে যা স্বাভাবিক আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। এগোতে সাহস পাই নি। সম্ভবতঃ বিরক্তিও প্রকাশ করেছি।"

বিক্রম শা রিসিভার ধরে রইলেন।

অলকা চৌধুরী বলল, "ভুল বুঝেছিলাম বলে ভুল বুঝবেন না।"

টেলিফোন নীরব হল। বিক্রম শার হাতের উষ্ণ স্পর্শেও তার মৌন ভঙ্গ হল না। মানুষের কণ্ঠ জড়বস্তুকে কী আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব দেয় এই মামুলী তত্ত্ব বিক্রম শা নূতন করে উপলব্ধি করলেন।

হস্টেলে তার স্পেশাল স্যুইটয়ের ড্রয়িং রুমে অলকা চৌধুরী টেলিফোন নামিয়ে রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত—ত্রিকালব্যাপী এই চিন্তায় কয়েকটা মুখ বারবার দেখে, আনুষঙ্গিক ঘটনার আয়নায় প্রতিবিম্বিত করে তার মনের কয়েকটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। কোনো স্পষ্ট উত্তর পেল না। উত্তরের ধরাছোঁয়া পরে দেখা দিল রহস্য। রহস্য ক্বচিৎ আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেয়। সচরাচর হতাশা ও আতঙ্কের চিহ্ন গাঢ়তর করে তোলে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করে অলকা চৌধুরী বিস্মিত হল। ক্লাবে বিক্রম শার সঙ্গে কথোপকথনে সে যে পার্ট তৈরী করে মুখস্থ বলেছিল, এখন তা কৃত্রিম বা সম্পূর্ণ মেকী বোধ হচ্ছে না। কোথাও যেন এক টুকরো জীবন্ত সত্তা আছে। মহারানী ও মৌনী তরুণী সম্বন্ধে তার ভীতি যেমন অলীক নয়, এবং তার কারণ শুভঙ্কর ঘোষ, তেমনি বিক্রম শা ও নিতান্ত গৌণ ভূমিকায় নেই। সাপখেলাতে সে বাঁশি বাজিয়েছে। বাঁশি শুনে ঈপ্সিত সাপের সঙ্গে এক নূতন সাপ দেখা দিয়েছে। তার ঈপ্সিত যে-সাপের মাথায় স্যমন্তক মণি, তার পাশে এই নূতন সাপও যেন নিজের একটা স্থান করে নিতে চায়। তার ধ্যানে শুভঙ্কর ঘোষের পাশে সে বিক্রম শার করুণ

মুখ দেখতে পায়। আসল বাঁচিয়ে একটা রফার প্রয়োজন বোধ করে।

বিক্রম শার, শুভঙ্করের ও অলকা চৌধুরীর কৌতূহলের পাত্রী অতিথি মহলের তরুণী এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে রানী মহলে ঢুকলো। মহারানীর ঘরে ঢুকে একটা কৌচে গা এলিয়ে দিল। মুখ থেকে রেশমী জাল খুলে নিয়ে পাশে রেখে বলল, "তোমার এই ম্যানেজারটিকে নিয়ে আর পারি না!"

মহারানী নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে একখানা উর্দু বই পড়ছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, "কেন? কী করেছে?"

মৌনী তরুণী তার কানের দু-পাশের চুল ঠিক করতে করতে বলল, "না, করে নি কিছুই। কর্তব্যজ্ঞানের বহরটা দিনে দিনে বাড়ছে। একটি কৌতূহলের পাহাড় বিশেষ। ডিঙোয় কার সাধ্য!"

মহারানী বইটা পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "হ্যাঁ। সম্প্রতি ওর কৌতূহল ও সতর্কতা দুই-ই বেড়েছে। কারণও যে নেই তা নয়। আগে অতিথি মহলে সকালে সন্ধ্যায় দুবার তোর হাজিরা দিতে হত। মাঝখানে আমাদের দুজনের ভিতর ব্যবস্থার ফলে কিছু কাল তোর আসা হয়ে ওঠে নি। অথচ অতিথি মহলের কাজ ঠিক-ঠাক চলছে। কৌতূহলের দো[illegible] কী?"

মৌনী তরুণী বলল, "বুঝলাম।" কী একটা কথা ভেবে তার মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঝঞ্ঝাট তুমিই বাধিয়েছ। কী দরকার ছিল আমাকে অতিথি মহলে টেনে আনবার?"

মহারানী বললেন, "কেন এনেছি তা এখনো না বুঝলে কোনো দিন বুঝবি না।"

মৌনী তরুণী আড়চোখে মহারানীকে দেখে নিল। তাঁর মুখে একটা থমথমে ভাব।

মহারানী বললেন, "তোর কর্মদোষে তুই থেকেও নেই। আত্মীয় বন্ধু মহলে তোকে কেউ দেখলে আঁতকে উঠবে। ভাববে ভূত দেখছে। সাধে কি তোকে আড়াল করে রাখি?"

মৌনী তরুণী বলল, "সবই জানি। শুনেছি আমার দেহ সংকার হয়েছিল। শ্রাদ্ধ শান্তি পর্যন্ত।"

মহারানী বললেন, "তুই যে কাণ্ড করে বেরিয়ে গেলি, বংশের মান বাঁচাতে গিয়ে বাবার ঐ ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় ছিল না।"

মৌনী তরুণী তিক্ত কণ্ঠে বলল, "মেরে ফেললেই পারতেন"

মহারানী বললেন, "বাপ হয়ে পারেন নি। আমিও তো দূরে ঠেলতে পারছি না। নিউ দিল্লীতেই আছিস। একটা নূতন নামে নূতন করে জীবন শুরু করেছিস। একটা সংসার পাতবার ব্যবস্থাও হয়েছে।"

মৌনী তরুণী তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "আহা! যা সংসার!"

মহারানী বললেন, "শক্ত হলেও সংসার তো!"

মৌনী তরুণী বলল, "বলো জেলখানা! নাম ভাঁড়িয়ে রেশমী জালে মুখ ঢেকে এই প্রতারণার জীবন আমার অসহ্য ঠেকছে।"

মহারানী বললেন, "আমার ঘরেও নয়, তোর নূতন সংসারেও নয়। বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য।"

মৌনী তরুণী তপ্ত কণ্ঠে বলল, "এত করেও আমাকে ফেরাতে পারো নি। সেদিন যে পথে চলেছিলাম, আজও সে পথেই চলেছি। খুশি মতো। কখনো আমার নূতন জেলখানার নিয়ম মেনে, কখনো কৌশলে নিয়ম ভেঙে।"

মহারানী উদাসী কণ্ঠে বললেন, "তুই নিজে না ফিরলে তোকে কে ফেরাবে? নূতন নাম নূতন সংসার কতটুকু করতে পারে?"

মৌনী তরুণী বলল, "অতিথি মহলে আমার কাজ তো তুমি দিব্যি চালিয়ে নিয়েছ।"

মহারানী হাসলেন। এ হাসিতে আলোর লেশ নেই।

মৌনী তরুণী বলল, "উদ্দেশ্য? হঠাৎ আমাকে নিজে থেকেই ছুটিও দিলে।"

মহারানী বললেন, "যেদিন খুলে বলার সময় আসবে বলব।"

মৌনী তরুণী বলল, "তোমার কথামতো নূতন অতিথিটিকে চা পার্টিতে ডেকেছিলাম।" মহাবানীর দিকে মুখ তুলে বলল, "তুমি মাখনের ছুরি দিয়ে হীরে কাটতে চাও?"

মহারানী বললেন, "নবম হতে পারে। ভোঁতা নয়।"

মৌনী তরুণী বলল, "কিন্তু মাখনেব ধারে তোমার কী লাভ?"

মহারানী বললেন, "সে কথা যে না ভেবেছি তা নয়। কিন্তু আমি ধারের কথা তত ভাবি না। আমি নবম একটা মন চাই। সহজেই নিজের ছাপ রেখে নিজের মনের মতো করে যাতে গড়ে নিতে পারি।"

মৌনী তরুণী বলল, "মহাবানী! তুমি শত হলেও নারী। পৌরুষের কোনো মূল্যই দাও না? মেয়েলী পুরুষের ভিতর কী পাবে? কাকে দেখবে?"

মহারানী বললেন, "নিজেকে।"

মৌনী তরুণী বলল, "আয়নারও একটা নিজের জোর থাকা চাই। সে জোর হচ্ছে তাব পিছনেব বাঁধ। মনের পিছনেও ইচ্ছার একটা বাঁধ দরকার। তাহলেই তাতে মুখ দেখা চলে। কাচ আর আয়না এক জিনিস নয়।"

মহারানীর মনে কথাটা দাগ কাটল। মুছে ফেলার চেষ্টায় মহারানী বললেন, "ষোলো আনা পুরুষ ষোল আনা নারী বলে কোনো জীব নেই। প্রতিটি নারীই কম বেশী পুরুষ, প্রতিটি পুরুষও কম বেশী নারী। আমাব যেটুকু পৌরুষ আছে তা দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করব।"

মৌনী তরুণী বলল, "তুমি সত্যিকারের শক্ত পুরুষকে ভয় পাও।"

মহারানী বললেন, "ওদের দম্ভ ও স্পর্ধাকে। পৌরুষকে নয়।"

মৌনী তরুণী বলল, "মুস্তাফার কথা তুমি আজও ভুলতে পারো নি।"

মহারানী বললেন, "কোনোদিন পারব না।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চিন্তায় ডুবে গেলেন। মহারানী প্রথম কথা বললেন, "মানুষটা খাঁটি কি না জানতে চেয়েছিলাম।"

মৌনী তরুণী বলল, "একটু বেশী খাঁটি। এজন্য প্রথম দিন চরম পরীক্ষায় ফেলতে দ্বিধা হল।"

মহারানী বললেন, "দ্বিধা কবলে ভুল করবি। তোর কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি। আমি বুঝতে চাই কত সহজে টলে। ঘা খেলে সামলে উঠতে পারে কি না। নরম মনেও যথেষ্ট জোর থাকতে পারে। জলের কি জোর নেই? কাঁচ তো শক্ত। অথচ কত ঠুনকো। কত সহজে ভাঙে।"

মৌনী তরুণী বলল, "খালি ভাবি যদি জড়িয়ে পড়ে। তোমার কাজেও লাগবে না। আমারও নূতন একটা অশান্তি হবে।"

মহারানী বললেন, "তোর অশান্তি? তোর বরং খোরাক বাড়বে।" তবু মহারানী যেন চিন্তিত হলেন। পরে বললেন, "তা হলেও ক্ষতি নেই। যে কাজে হাত দিয়েছি তার হিসেব অনেক বড়। আমিও যদি একদিন বাতিল হয়ে যাই, কাজ কি থামবে? সাধনা তো পৃথিবী জুড়ে চলছেই। আমার সাধনা আব কেউ করবে।"

মৌনী তরুণী বলল, "বেশ। তোমার কথামতো কাজ হবে। আর একদিন ডেকে পাঠাবো।"

মহাবানী বললেন, "বেশী দেরী করিস নে। যত তাড়াতাড়ি আমার অতিথিটিকে বুঝতে পারি, কাজ এগোয়।" তরুণী উঠে দাঁড়াতে মহারানী উঠলেন। ঘবের আবহাওয়া হাল্কা করার জন্যই যেন বললেন, "এখন বল তোর পেয়িং গেস্টের খবর কী?"

মৌনী তরুণী বলল, "এখনো হাতে আছে। আমার কথায় মুখ বুজে তোমার কাজ করেছে। চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের অতিথি

জোটানোর ব্যাপারে, আমার পাল্লায় ঘোষকে এনে ফেলার ব্যাপারেও।"

মহারানী বললেন, "তবু যতটুকু না জানালে চলে না ততটুকুই জানাবি। পুরুষ মুখ বুজে থাকে বলেই চোখ কানও বুজে থাকবে, ধরে নিস নে।"

মৌনী তরুণী বলল, "আমার পেয়িং গেস্ট সম্বন্ধে তোমার কোনো ভয় আছে না কি ?"

মহারানী বললেন, "নিজেকে জাহির না করে তোকে কিসের জোরে হাতের মুঠোয় রেখেছে ভেবে একটু যে ভয় পাই না বললে মিথ্যে বলা হবে বিদিশা।"

বিদিশা বলল, "আমাকে হাতের মুঠোয় ?"

মহারানী বললেন, "তা নয় তো কী ?"

দুজনের ভিতর দৃষ্টি বিনিময় হল। কেন দুজনেই বুঝলেন।

মৌনী তরুণী প্রস্থান করার পর মহারানী বিছানাব পাশে কৌচে গালে হাত দিয়ে চিন্তায় বসলেন। অসাধারণ মনের জোরে মুস্তাফার স্মৃতি মনের এক কোণে সরিয়ে রেখেছিলেন। মুস্তাফার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মনেব কপাট খুলে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তরুণী চলে যেতে মহাবানী মন আলগা করে দিলেন। খোলা কপাট দিয়ে স্বচ্ছন্দে অতীত ও মুস্তাফা ঢুকে পড়ল। মহারানীর বিগত জীবনের এক গুপ্ত অঙ্কের উপর যবনিকা উঠে গেল।

অলকা চৌধুরী তখন ছ বছরের শিশু। অলকার বড় বিদিশার বয়স বারো। তমিস্রা অর্থাৎ মহারানী তখন ষোড়শী। মহারানীর পিতা তখন জীবিত। এই সময়ে মুস্তাফার আবির্ভাবে উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মুস্তাফা এক মূর্তিমান রহস্যের মতো আবির্ভূত হন। সূক্ষ্ম জালের আবরণের

ভিতর দিয়ে যা দেখা যেত, তা তাঁর মুখ নয়, মুখোশ। তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মাঝখানের কয়েকটা বছরে একদিন এক মুহূর্তের জন্য এ আবরণ উন্মোচন করেন নি। কৌতূহলী হয়ে কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন, "মুখের কথায় আমরা যতটা ঠকাই তার চেয়ে বেশী ঠকাই মুখের ও চোখের নীরব ভাষায়। কখনো আমার অজ্ঞাতসারেও যাতে কেউ আমার হাতে প্রতারিত না হন, সে জন্যই এই আবরণ।" মহাতাত্ত্বিক সৈয়দ সিদ্দিকির কাছে একদিন বিশ বছরের তরুণ মুস্তাফা জীবন সমস্যার কয়েকটি গূঢ় প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হন। সিদ্দিকি তাঁর নীরন্ধ্র তত্ত্বের আশ্রয়ে উপলব্ধির আশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মুস্তাফার প্রশ্ন, তাঁকে বিশেষ বিচলিত করল। তাঁর তত্ত্বে তিনি প্রথম কয়েকটা রন্ধ্র দেখতে পেলেন। সিদ্দিকি মুস্তাফাকে বললেন, "তোমার প্রশ্নের জবাব তুমিই দাও। আমি শুনি।"

মুস্তাফা জবাবে বললেন, "সেজন্য সাধনার প্রয়োজন। সুযোগ দিন।"

সিদ্দিকি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী সুযোগ চাও?"

মুস্তাফা বললেন, "বাসস্থানের ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা।"

সিদ্দিকি বললেন, "বেশ। আমার এখানেই থেকে যাও। তোমার পরিচয়?"

মুস্তাফা হেসে উঠে বলেছিলেন, "সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারি। যে প্রশ্নগুলি নিয়ে এসেছি, একদিন সেগুলিরও। কিন্তু এই একটি প্রশ্নের জবাব দেবার পথ ঈশ্বর রাখেন নি।'

সিদ্দিকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি পিতামাতার পরিচয় জানো না?"

নির্বাক থেকে মুস্তাফা সেদিন তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

বিশ বছর বয়সে মুস্তাফা সিদ্দিকির আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাঁচ বছর দণ্ড প্রহরের হিসেব না রেখে মানুষের সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে একটানা সাধনা চালালেন। এই পাঁচ বছর তাঁর জগৎ বলতে ছিল

একটা ছোট ঘর ও এক ফালি ছাত। পাঁচ বছর বাদে এই জগতের খোল ফেটে বার হলেন এক নূতন মহাজ্ঞানী মুস্তাফা। যে প্রশ্নের যে উত্তর নিয়ে তিনি আবির্ভূত হন তাতে বহু সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ভিত নড়ে যায়। চিরকাল যা হয়ে থাকে মুস্তাফাকে নিয়ে উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের সৌখীন মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তমিস্রা চৌধুরীর বয়স তখন একুশ। এই সময় মুস্তাফার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

মহারানী তমিস্রার মনে অল্প বয়সেই নানা কী ও কেন সাড়া দিয়েছিল। তিনি একা থাকতে ভালবাসতেন। যখন একা থাকতেন হঠাৎ কেউ নাম ধরে ডাকলে যে ভাবে চমকে উঠতেন মনে হত তাঁকে অন্য কোনো জগৎ থেকে টেনে আনা হল। মুস্তাফার আবির্ভাবের সময়ে মহারানী তমিস্রার মনের প্রশ্নগুলি জটিল, কঠিন ও তীব্র হয়ে পড়েছিল। একদিন তত্ত্বালোচনার বৈঠকে তিনি মুস্তাফার কাছে তাঁর একটি প্রশ্নের জবাব চান। মুস্তাফা জবাব দেন। তার পরই উৎসুক দৃষ্টিতে মহারানীকে ভালো করে দেখে নেন।

সুতরাং কিছু কাল পরে নিউ দিল্লীতে চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে মুস্তাফার আগমন মোটেই অযৌক্তিক বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। মহারানী তমিস্রা চৌধুরী ও মুস্তাফা ক্রমশ সঙ্গত কারণেই পরস্পরের নিকটে এসে পড়েন। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন সঙ্গত কারণেই তাঁদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা ও ভাবী সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে, হঠাৎ মুস্তাফা নিরুদ্দেশ হন। কেন, এ প্রশ্নের জবাব মহারানী তমিস্রার কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। তিনি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাফরীর আড়ালে অন্ধকারে আলোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। মুস্তাফা সভ্যজগৎ থেকে সেই যে অন্তর্ধান করলেন, তাঁর কোনো খবরই কেউ পেল না। বুদ্ধ চৈতন্যের তুল্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে মুস্তাফা এসেছিলেন, তিনি জীবন সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেলেন।

মুস্তাফা ও মহারানী তমিস্রা পরস্পরকে প্রচণ্ড টানে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু যে কারণে অতীতে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তার গ্লানি মন থেকে মহারানী একেবারে মুছে ফেলতে পারেন নি। কার ভুল, এই সংশয় যখনই তাঁকে বিদ্ধ করত তিনি স্মৃতির কপাট চেপে ধরতেন। আজ সেই কপাট খুলে গিয়েছিল।

মুস্তাফা কোথায়? জীবিত না মৃত? আজ যদি মুস্তাফা হঠাৎ স্বশরীরে নিউ দিল্লীতে আবির্ভূত হন, তাঁর সাধনার উপর কী কঠোর মন্তব্য করবেন ভেবে মহারানী অস্বস্তি বোধ করেন। মুস্তাফা যদি অবজ্ঞায় একটি কথাও না বলেন, চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ের উপর দৃকপাত না করেন, মহারানী তমিস্রার নিজেরই তাঁর ও শুভঙ্করের ভাবী যুগ্ম সাধনায় মন কতটা অটল থাকবে?

রাতে মহারানী শুভঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। শুভঙ্কর সেদিনও সারাটা দিন আমেদের কথা মতো ঘটনার অপেক্ষায় ছিল। একবার তার মনের অস্থির মুহূর্তে অলকা চৌধুরীকে টেলিফোন করেছিল। ক্লাবে ও হস্টেলে দু জায়গায়। কোথাও তাকে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। জাহানারা বেগমকে টেলিফোন করতে গিয়ে হাত ওঠে নি। জাহানারা এমনই একটা জগতে বাস করে যেখানে টেলিফোন করার আগে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে হয়। শেষে ধানক্ষেতে বেগুন কুড়োনোর মনোবৃত্তি নিয়ে বিক্রম শাকে টেলিফোন করেছিল। কথা বেশী দূর গড়ায় নি। কুশল প্রশ্নে শেষ হয়েছিল। সুতরাং মহারানীর ডাকে সাগ্রহে শুভঙ্কর অনতিবিলম্বে রানীমহলে হাজির হল।

মহারানী ভণিতা না করে কথা শুরু করলেন। বললেন, "কয়েক দিন আগে আমার সাধনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কেন আপনাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম।"

শুভঙ্কর ঘাড় নাড়ল।

মহারানী বললেন, "কিন্তু বিষয়টা কত গুরুতর হয়তো বুঝিয়ে উঠতে পারি নি।" একটু থেমে মহারানী বললেন, "বাইরে থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভিতরে কুণ্ডলী পাকানো গোড়ায় যত কঠিনই হোক না কেন শেষমেষ সাধনার পথ সহজ করে দেয়। বহির্জীবন থেকে আমূল বিচ্ছিন্ন হয়ে সত্যের সাধনা, মাটির তলা থেকে শিকড় উপড়ে ফেলে আকাশে উড়তে উড়তে আকাশ জয়ের চেষ্টা সহজ নয়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের কঠিন মাটির তলায় শিকড় অটুট রেখে আকাশে হাত বাড়ানো, পায়ে বেড়ী পরে ওড়ার চেষ্টা। কিন্তু মাটি যদি এমন হয় আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়, যদি তার বুকে আকাশের গন্ধ পাই, তা হলে চেষ্টা করা চলে। মাটির জায়গায় সংসারের কথা ভাবুন। সংসার মানে শুধু পুত্রকলত্র নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় বন্ধন। ঐ বন্ধন থাকলে ঈশ্বর সাধনায় থেকে থেকে টান পড়ে। কিন্তু ঐ মানুষের ভিতর যদি ঈশ্বরকে কিছুটা পাই, অন্ততঃ তার কথা মনে পড়ে, তা হলে বন্ধন পথের বাধা না হয়ে রথের চাকা হতে পারে। ঐ বন্ধন ছিন্ন না করেই কখনো কখনো তারই জোরে ঈশ্বর সাধনা, সত্যের সন্ধান চলতে পারে। সেদিন আমি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।"

শুভঙ্কর বুঝল মহারানীর কথা শেষ হতে অনেক বাকী। তার পক্ষে শ্রোতার ভূমিকা ধরে থাকা ভালো।

মহারানী বললেন, "আমি জ্ঞানী গুণীদের অতিথি মহলে এনে ঠকেছিলাম। তাঁদের মনের মাটি ছিল পাথরের মতো শক্ত। নরম মাটি খুঁজছিলাম, যেখানে নিজের ছাপ রাখতে পারি। শক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপটাও শক্ত হবে। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কার কথা বলছি। আপনার কথা। আপনার নরম মন দিয়ে আমার গভীর প্রয়োজন। যদি ছাপ রাখতে পারি, মাটি থেকে শিকড় উপড়ে ফেলার দরকার হয় না। মাটিতে পা রেখেই ঈশ্বরের সন্ধানে হয়ত হাত বাড়াতে পারি। যদি মাটির গুণে শিকড় বাড়তে থাকে, যোজনের

পর যোজন বেড়ে চলে, মাটির বন্ধনে থেকে উড়তেও বাধা থাকে না।" একটু বাদে মহারানী বললেন, "অবশ্য যদি বাধা না পাই। নরম মাটিতেও পাথরের কণা থাকতে পারে। একটু নাড়াচাড়াতেই দ্রুত পাথর হবার ক্রিয়া শুরু হতে পারে।"

শুভঙ্কর তখনও শুনছে। তার মনের কয়েকটা প্রশ্ন দূরে ছায়ামূর্তির মতো অপেক্ষা করছে।

মহারানী বললেন, "আমি আজ একটা প্রশ্নের জবাব চাই। আমি কি আপনার উপর নির্ভর করতে পারি?"

শুভঙ্কর জবাব দিতে গিয়ে ভিতর থেকে বাধা পেল। সে কি মহারানীর প্রশ্ন পুরোপুরি বুঝেছে? মহারানীর সাধনার ব্যাখ্যাই হচ্ছে আসলে একটা কঠিন প্রশ্ন।

মহারানী বললেন, "আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন, সন্দেহ করি না, আমার সঙ্গও হয়তো অপ্রীতিকর নয়। কিন্তু আমার সাধনার শিকড়কে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুগভীর স্তরে রক্ষা করতে গেলে আমার সঙ্গে কী নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হবে ভেবে দেখেছেন? আমার সাধনার জ্যোতির্ময় ছায়া আপনার উপর পড়বে, আমার মনের প্রসাদের ভাগও আপনি পাবেন। কিন্তু আপনার সর্বত্রই আমার নিশান উড়বে। আপনার দিক থেকে আমার সাধনার অর্থ হবে আপনার আত্মবিলোপের সাধনা। কল্পনা করুন বছরের পর বছর আপনার এ ভাবে কাটবে। আপনি মাটি, আমি ফসল। আপনি স্থিতি, আমি সৃষ্টি।" একটু দম নিয়ে মহারানী বললেন, "আপনার বাইরের জীবনে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন। কিন্তু সেখানে এমন কিছু না ঘটে যাতে সাধনার ব্যাপারে কোনো রফা করতে হয়। এটুকু বাদে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। শুধু আমার অনুমতি ছাড়া নিউ দিল্লী ছেড়ে কোথাও যাবেন না। দরকার হলে নিশ্চয়ই যাবেন। কিন্তু আমাকে জানিয়ে।"

শুভঙ্কর তখনও শ্রোতা। তার গত্যন্তর নেই। কিছুক্ষণ পরে

মহারানী বললেন, "মিস্টার ঘোষ, আমি আপনার উত্তর চাই।"

শুভঙ্কর তার মনের কপাট ধরে নাড়া দিল। কী সাড়া পেল সেই জানে। জাফরীর দিকে মুখ তুলে বলল, "অতিথি মহল থেকে আমার হঠাৎ অন্তর্ধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। আপনার কথা সম্পূর্ণ না বুঝলেও শুনতে আমার ভাল লাগে। আমাকে শুনতে দিন, বুঝতে দিন, তৈরী হতে দিন। আমার ভিতর থেকে ধীরে সুস্থে সুবিধেমতো আপনার প্রশ্নের উত্তর আদায় করে নিন। আজ হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে গেলে ভবিষ্যতে তার কোনো অর্থ নাও থাকতে পারে।"

মহারানী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সাধনা কি শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে? মানুষকে নিয়েও। এই অনভিজ্ঞ যুবককে নিয়েও। সব জলে মুখ দেখা যায় না। শুভঙ্কর কোন্ শ্রেণীর জল, মহারানী চিন্তা করেন। যে পরীক্ষার কথা আজ মৌনী তরুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তার চোট লাগুক। সেদিন শুধু আশ্রয়ের আশায়ই হয়তো শুভঙ্কর তাঁর সাধনায় নরম মাটির ভূমিকা নিতে কোনো দ্বিধা করবে না।

পরদিন অফিসে পৌঁছে কয়েক মিনিট বাদেই শুভঙ্কর আমেদের টেলিফোন পেল।

আমেদ জিজ্ঞাসা কবল, "খবর কী?"

শুভঙ্কর বলল, "খবর তো তোমার কাছে!"

আমেদ বলল, "আমার খবর উপসংহারের কাছাকাছি গিয়ে পাবে।" একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, "মহারানী ডেকেছিলেন?"

শুভঙ্কর সংক্ষেপে মহারানীর সঙ্গে তার আলোচনার বিষয় বলল। আসল জায়গা বাদ দিয়ে। কিন্তু কী বাদ গেল আমেদ সহজেই অনুমান করে নিল। বলল, "খবরের কাগজের রিপোর্টার হলে হয় চাকরী খোয়াতে, নয় প্রমোশন পেতে।"

শুভঙ্কর হাসল। বলল, "কেন?"

আমেদ বলল, "বুঝে নাও।" তারপর বলল, "মনে প্রাণে রিপোর্টার হয়ে যাও। যদিও আসলে খবর তুমি নিজে। অলকা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

শুভঙ্কর বলল, "দেখা হওয়া দূরের কথা টেলিফোন করে করে হয়রান হয়ে গিয়েছি।"

আমেদ বলল, "দরকার হলে ভোর রাতে দরজার কড়া ধরে নাড়তে হবে। তাকে তোমার ব্যক্তিগত ঘটনায় জড়াতে হবে। তাতে তাকে যতটা পাবে কথায় তার শতাংশ পাবে না। জাহানারাকে একেবারে ভুললে চলবে না। তোমার পথ তিন দিকে গিয়েছে। মহারানী, অলকা চৌধুরী ও জাহানারা। এর ভিতর একটা পথ বেছে নিতে হবে।"

শুভঙ্কর জবাবে বলল, "বুঝেছি। ধন্যবাদ।" মনে মনে বলল, "আমার একটাই পথ।" তার পরই তার মনে প্রশ্ন জাগল, "একটাই?"

শুভঙ্করের সঙ্গে টেলিফোন শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেই আমেদ আবার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। অপর প্রান্তে জাহানারা রিসিভার তুলে বলল, "আমেদ?"

আমেদ বলল, "এত সহজে অনুমান করেছ ব্যাপার কী?"

জাহানারা বলল, "না, তোমার টেলিফোনের অপেক্ষায় ছিলাম।"

আমেদ জিজ্ঞাসা করল, "কোনো নতুন খবর?"

জাহানারা বলল, "মহারানী এতদিন অতিথি মহলে আমার কাজ চালিয়ে এসেছিলেন। আজ ডেকেছিলেন।"

আমেদ জিজ্ঞাসা করল, "কী বুঝলে?"

জাহানারা বলল, "শুভঙ্করকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগবেন মনে হচ্ছে।"

আমেদ বলল, "লাগবেন কি, লেগেছেন বলো।"

জাহানারা বলল, "হতে পারে। তবে আমার মনে হয় শুভঙ্কর উপলক্ষ্য মাত্র। শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে কি না সন্দেহ।"

আমেদ বলল, "তোমার কথার ভাষ্য প্রয়োজন।"

জাহানারা বলল, "ভাষ্য এই যে এখনো মুস্তাফাকে ভুলতে পারেন নি। মুস্তাফা তাঁর সাধনার খুঁটি হতে চেয়েছিল। মহারানী প্রমাণ করতে চান যে তাঁর খুঁটি তিনি নিজেই। এজন্য মুস্তাফার বদলে শুভঙ্করকে নিয়েও তাঁর কোনো লোকসান নেই।"

আমেদ শুনল। মনে মনে ভাবল, বরং লাভ। তাঁর দুচোখে অনেক দিন আগের একটা আগুন দু-এক মুহূর্তের জন্য জ্বলল। তারপর শান্তকণ্ঠে সে বলল, "কতকটা তাই। তবে মহারানীব সাধনায় নতুন একটা উপসর্গ দেখা দেবে। শুভঙ্করের মুক্তিব কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দেরী নেই। এ ব্যাপারে আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। শুভঙ্করকে যে ভাবে হোক টেনে আনো, তাব একটা নতুন সমস্যা হবার চেষ্টা করো। সে হয় অলকার দিকে ঝুকুক, নয়"—আমেদ কথা শেষ করল না।

জাহানারা বলল, "এ বিষয়ে দেখছি তোমার সঙ্গে মহারানীর অসম্ভব মিল। তিনিও এ কথা বলছেন।"

আমেদ বলল, "মিলের আড়ালে অমিল। কারণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।" মনে মনে বলল, "মিল থাকা বিচিত্রও নয়। একজন জেনে, আর একজন না জেনেই হয়তো একটা স্থায়ী মিল খুঁজছি।"

টেলিফোনে ক্লাবে বা হস্টেলে কোথাও অলকা চৌধুরীকে ধরতে না পেরে শুভঙ্কর লাঞ্চের ঘণ্টায় সোজা অলকা চৌধুরীর ক্লাবে হাজির হল। বেয়ারার হাতে কার্ড পাঠিয়ে সে ক্লাবের অফিসের সম্মুখে পায়চারী করতে লাগল। সে প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিল অলকা চৌধুরী হরিণীগতিতে ক্লাবের সুদীর্ঘ বারান্দা বেয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে আসবে। কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা মন্থর গতিতে ফিরে এসে

জানালো মেম সাহেব কোনো এক সাহেবের সঙ্গে জরুরী আলোচনা করছেন। একটু দেরী হবে। বেয়ারার নির্দেশ মতো শুভঙ্কর ক্লাবের বারোয়ারী বসবার ঘরে বসে একটা সচিত্র ম্যাগাজিন-য়ে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল।

প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল। অলকা চৌধুরীর কোনো পাত্তাই নেই। সেই বেয়ারাও ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। শুভঙ্কর বারান্দায় বার হয়ে এসে পায়চারী করতে লাগল। সন্দেহ হল বেয়ারা কার্ড আদৌ অলকা চৌধুরীর হাতে দিয়েছে কি না। তাকে আর কারো সঙ্গে বসে থাকতে দেখে নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে হয়তো অপেক্ষা করতে বলেছে। শুভঙ্কর দোয়ামনা করে বারান্দার শেষ প্রান্তে তার পরিচিত টেবিলের উদ্দেশে রওনা হল।

অলকা চৌধুরীর টেবিল তখনও ফাঁকা হয় নি। অভ্যাগত তখনও বসে আছেন। অলকা চৌধুরী হাত নেড়ে কী বোঝাচ্ছে। তিনি নিবিষ্ট মনে শুনছেন। শুভঙ্কর তাকে পিছন থেকে দেখল।

শুভঙ্কর তখনও খানিকটা দূরে। অলকা চৌধুরী হঠাৎ তাকে দেখতে পেল। তার মুখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। তাকে অপ্রস্তুত বিব্রত দেখাল। সে ঈষৎ হেসে উঠে দাঁড়ালো। একই সঙ্গে অভ্যাগত পিছন ফিরে তাকালেন। শুভঙ্কর দেখল বিক্রম শা।

যে কারণেই হোক শুভঙ্কর থেমে গিয়েছিল। থামবার রকমটা যেরকম, স্তব্ধ, নিশ্চল, চিত্রাপিত কথাগুলির যে কোনো একটা অনায়াসে প্রয়োগ করা যেত। শুভঙ্করের মুখে যে পরিবর্তন ঘটল সেই সঙ্গে তার হঠাৎ অর্ধপথে থেমে যাওয়ার দৃশ্যটা অলকা চৌধুরীকেও দু-তিন মুহূর্তের মতো নিশ্চল করে দিল। এ এমনই একটা পরিস্থিতি যখন মানুষ ক্বচিৎ যুক্তির পথে চলে। শুভঙ্কর হঠাৎ অসম্ভব দ্রুতপদে ফিরে চলল।

অলকা চৌধুরীরও বুদ্ধি লোপ পেল। সে বসে পড়তে পারত। ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার করা সম্ভব ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিতে

পারত। অন্ততঃ বিক্রম শা-কে বলতে পারত শুভঙ্করের পিছু নিতে। বিলম্বের জন্য অলকা চৌধুরীর হয়ে বিক্রম শা-র মতো কৌশলী ব্যক্তির পক্ষে শুভঙ্করের কদর বাড়িয়ে ক্রটি স্বীকার করা কঠিন হত না। কিন্তু অলকা চৌধুরী সে পথ না ধরে চিরাচরিত পথ ধরল। সে শুভঙ্করের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল। শুভঙ্কর না থামায় সে দ্রুতপদে টেবিল ছেড়ে এসে বারান্দা দিয়ে প্রায় ছুটে চলল। অলকা চৌধুবী যখন বারান্দার অধেক পথ এসেছে শুভঙ্কর গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বারান্দা থেকে নেমে ঊর্দ্ধশ্বাসে লন অতিক্রম কবে সে যখন বাইরে এল শুভঙ্কবের গাড়ি তখন চলতে শুরু কবেছে।

অলকা চৌধুরী তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। হঠাৎ এ কী হল? খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ক্লাবেব বাইবে চওড়া ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। তাবপব অস্থির মনে ফিবে এল। তাব পা যেন চলছিল না। কোনো রকমে সে বারান্দায় উঠে এল। বাবান্দার মোড় ঘুবতেই শেষ প্রান্তে তাব টেবিল দেখা যায়। তার টেবিল খালি। দুরু দুরু বুকে সে টেবিলে ফিবে এসে বসল। ছাইদানে চাপা দেওয়া বিক্রম শা-র লেখা একটা চিরকুট। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য: আই অ্যাম সো সবী। মাই সিন্‌সিয়ার্ অ্যাপলজিজ্।

অলকা চৌধুবী ক্লাবের বারান্দায় তাব টেবিলে বসে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় পিষ্ট হতে হতে একটা বেদনামুখর পিণ্ডে পরিণত হল। কতটা স্পষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কতটা আচ্ছন্ন অবস্থায় সে তার গাড়িতে উঠল বলা কঠিন। প্রথম গেল শুভঙ্করের অফিসে। তাকে পেল না। সেখান থেকে চৌধুবী কাস্‌লয়ে। সেখানে শুভঙ্কর তো নেই-ই, বিক্রম শাও ফেরেন নি। অগত্যা সে যমুনার দিকে গাড়ি চালালো। গাড়ি বেঁধে তার পরিচিত আসনে বসল। কিন্তু দিনের যমুনার ভিতর রাতের যমুনাকে খুঁজে পেল না। নালিশ জানানো হল না। প্রতিবিধানের আশ্বাসও মিলল না।

শুভঙ্কর জাহানারা বেগমের ড্রয়িংরুমে একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, "অসময়ে উৎপাত করলাম। কী মনে করছেন জানি না।"

জাহানারা বলল, "সে কী! আপনি আমার কম উপকার করলেন? জরুরী দরকারে আমি আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

জরুরী দবকার? শুভঙ্কর অবাক হল। জাহানারা বলল, "ভাবছেন তামাসা করছি।"

শুভঙ্কর বলল, "না, তা ভাবব কেন। আমার সাধ্যের ভিতর হলে—"

জাহানারা কটাক্ষ হেনে বলল, "সাধ্যের ভিতর? এমন দরকার আপনি ছাড়া কারো সাধ্য নেই যে মেটায়।" শুভঙ্করকে বিস্ময়ের সপ্তমে তুলে বলল, "দরকার আপনাকে দিয়ে। আমার দরকার আপনি।"

শুভঙ্করের বুক ঢিপ করে উঠল।

জাহানারা বলল, "আর কারো ভিতর আজ পর্যন্ত যা পাই নি, আপনার ভিতর স্বল্প পরিচয়েই পেতে শুরু করেছি। মনে লোভ ধরেছে।"

লোভের উল্লেখে শুভঙ্করের শুধু মন নয়, দেহও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

জাহানারা বলল, "আজ মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়ল। ভেবে-ছিলাম টেলিফোনে ধরতে না পারলে সোজা গিয়ে অফিসে ধরব।"

শুভঙ্কর জাহানারার কথার গোলক ধাঁধায় উত্তরের একটা পথও খুঁজে পাচ্ছে না। অলকা চৌধুরীর ব্যাপারে একেই মন অত্যন্ত অবসন্ন, তার উপর জাহানারার কথার গোলমেলে সঙ্কেত।

শুভঙ্কর বিশেষ বুদ্ধি খরচ করে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সাধারণ একটা কথা বলল। বলল, "আমি সামান্য লোক—"

জাহানারা বলল, "সে বিচারের ভার নয় নাই নিলেন।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি কি নিজেকে বুঝি না ?"

জাহানারা বলল, "বড়াই করে বসলেন। নিজেকে কে কবে বুঝলো ?"

শুভঙ্কর বলল, "তবুও—"

জাহানারা বলল, "বড় জোর বলতে পারেন আমাকে বোঝেন।"

শুভঙ্কব নিবাক।

জাহানারা জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে আপনার কী রকম লাগে ?"

অতি দুঃখেও মহাবিব্রত শুভঙ্কর হাসল।

জাহানারা বলল, "জবাবটা আপনার হয়ে দিতে পারি। আমাকে আপনার বেশ ভাল লাগে।"

শুভঙ্কব মরিয়া হয়ে উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই।"

জাহানারা বলল, "শুধু বেশ নয়। খুব।"

শুভঙ্কর বুঝলো জাহানাবা কথাচ্ছলে তাকে কোথায় টেনে নিতে চায়। তবু, শত আশঙ্কা সত্ত্বেও কোনো অজুহাতে জাহানাবার সান্নিধ্য ত্যাগ কবার ক্ষীণ একটা ইচ্ছাও নিজের ভিতর খুঁজে পেল না।

জাহানাবা কথাব মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বলে, "আপনাব শরীরটা কি ভালো নেই ?"

শুভঙ্কর বলল, "এই একটু—"

জাহানারা বলল, "একটু কী ? মনে হচ্ছে বেশ কিছু হয়েছে। জ্বরটর হয়নি তো ? খেয়েছেন ?"

শুভঙ্কর বলল, "শরীরটা ভালো ঠেকছে না বলে লাঞ্চ বাদ দিয়েছি।"

জাহানাবা বলল, "দেখি।" উঠে এসে শুভঙ্করের কপালে হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি ধরে নাড়ি দেখার ভান করে বলল, "না জ্বর নেই। কিন্তু নাড়ি খুব দুর্বল। বসুন। এক কাপ কফি নিয়ে আসি।"

জাহানারা দ্রুতপদে ভিতরে ঢুকে গেল। অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে

শুভঙ্কর মনের একটা নিবিড় আরাম উপভোগ করতে লাগল। ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের এলাকার বাইরে চলে গেল।

কফি এনে শুভঙ্করের সম্মুখে রেখে জাহানারা বলল, "চট করে খেয়ে ফেলুন। আপনাকে বড় কাতর দেখাচ্ছে।"

জাহানারা বলল, "আপনার মতো লোকের একা থাকা উচিত নয়।" পর মুহূর্তেই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল, "ভুল বললাম। সংসারের চাপ আপনার সহ্য হবে না। একাই থাকা উচিত। তবে সংসারে কোনো ভাগ না পেয়েও নিঃস্বার্থভাবে আপনার দেখাশোনা করবে এমন একটি মানুষের দরকার। আপনাকে দেখে মায়া হয়। ইচ্ছে হয় আপনার জন্য কিছু করি। ভয়ও হয় যদি ভুল বোঝেন।"

শুভঙ্কর বলল, "না না। ভুল বুঝবো কেন?"

জাহানারা বলল, "বাঁচালেন।" সোফা ছেড়ে এসে শুভঙ্করের কোটে একটা টান দিয়ে বলল, "খুলুন। হাল্কা হয়ে আরাম করে বসুন।"

কোটটা নিয়ে একটা সোফার পিঠে পেতে দিয়ে জাহানারা ফিরে এল। নিজের সোফায় নয়। শুভঙ্করের সোফায় তার অত্যন্ত নিকটে।

একটু পরে সোফা ছেড়ে উঠে এল। শুভঙ্করের পিছন থেকে সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখতে দেখতে বলল, "হঠাৎ কী ভাবছিলাম জানেন? কেউ কোথাও নেই, জানাজানির ভয় নেই এমন একটা জায়গায় আপনাকে পেলে কী না করি!" শুভঙ্করের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে তার দু'গালের উপর দিয়ে সন্তর্পণে দু'হাত নামিয়ে এনে ডান হাতে তার চিবুক ধরে সস্নেহে নেড়ে বলল, "ভীষণ আদর করতাম। অনেক রকমে। কোনো আপত্তি শুনতাম না।" জাহানারা তার সোফায় ফিরে গিয়ে বসল। তার মুখে চিরবিশ্রুত পুরুষজয়ী কুহকিনী হাসি। তার চোখে চোখ পড়তে শুভঙ্কর মুখ নামিয়ে নিল।

জাহানারা বলল, "বসে বসে আপনার কোনো বিশ্রামই হচ্ছে না। শোবেন?"

শুভঙ্করের ছ'কান গরম হয়ে উঠল।

জাহানারা সম্মুখে এসে তার একটা হাত ধরে টানতে শুভঙ্কর উঠল। তাকে আলগোছে জড়িয়ে নিয়ে জাহানারা বলল, "চলুন।"

জাহানারা শুভঙ্করকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। কয়েক হাতের স্থলজ্ঘ্য ব্যবধান। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। সুমধুর পাপের অকুণ্ঠ আহ্বান।

হঠাৎ শুভঙ্করের চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরে যাবার ছুটো দরজা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুভঙ্কর জাহানারার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একটা দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল।

পুরনো বড় শহরে কখনো কোনো গলি দিয়ে পথ চলতে চলতে সম্মুখে তাকিয়ে মনে হতে পারে অন্ধগলি। ফিরে উল্টোমুখে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। তবু ইতস্তত করে কৌতূহলবশতঃ কয়েক পা আরো এগিয়ে গেলে দেখা যাবে ডাইনে হোক বাঁয়ে হোক গলিটা মোড় নিয়েছে। এবং সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। পুরনো বড় শহরে যারা নতুন পথ হাঁটছে, তাদের অনেকেরই এ অভিজ্ঞতা কখনো না কখনো হয়েছে। মানুষের কাছে তার জীবনের চেয়ে বড় পুরনো শহর আর কী থাকতে পারে! এই শহরে অলকা চৌধুরী নতুন পথ হাঁটছে। সেদিনের অভিজ্ঞতা তার কাছে একটা অন্ধ গলি বলেই মনে হল। একধারে শুভঙ্কর, অন্যধারে বিক্রম শা। সম্মুখে গলির মুখোমুখি একটা দেয়ালের মতো সেদিনের সমস্যা। অলকা চৌধুরীর মনে হল ফিরে না এসে উপায় নেই। কিন্তু সারা সন্ধ্যা সারারাত সে চোখ মেলে রেখে পথের আশায় ক্লান্ত পায়ে এগোলো। হঠাৎ পথ দেখল। অপ্রত্যাশিত। কিন্তু দৈব অনুগ্রহ নয়। যুক্তি-যুক্ত সোজা পথ। সকলের মতো যে বড় রাস্তায় সে পৌঁছতে

চায় অপ্রত্যাশিতভাবে গলিটা হঠাৎ বেঁকে সেদিকে অবাধে চলে গিয়েছে।

ভোরের দিকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে বার হবার এই পথ হঠাৎ আবিষ্কার করল। যে-বিষয়টা আবেগে আঘাতে মুহ্যমান হয়ে তলিয়ে দেখতে পারে নি, পরিষ্কার বুঝল। সে শুভঙ্করকে ডাকে নি। শুভঙ্কর নিজের গরজে এসেছিল। তাকে একা না পেয়ে এবং বিক্রম শার সঙ্গে তাকে দেখে ফিরে গিয়েছিল। আসা ও ফিরে যাওয়া, বিশেষ করে ফিরে যাওয়া মোটেই স্বাভাবিক তুচ্ছ ঘটনা নয়। তার অর্থ সুস্পষ্ট। প্রত্যাশা ও অভিমান। তার প্রতি শুভঙ্করের বিশেষ মনোভাব। এ মনোভাবের আসল অর্থ কী, অন্ততঃ একদিন কী হতে পারে, স্পষ্ট বুঝলো।

প্রেম যখন সচেতন হয়ে ওঠে মনের সব কুণ্ঠা কেড়ে নেয়। অলকা চৌধুরী মনের সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে শুভঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরী হল।

সওয়া বারোটা তক শুভঙ্করের কামরার টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই অপারেটর বলল, "আপনাকে চাইছেন, মিস চৌধুরী।" তারপর অপারেটর অলকা চৌধুরীকে সম্বোধন করে বলল, "কথা বলুন।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমি।"

শুভঙ্কর নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করে বলল, "বলুন।"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, "কী করছেন?"

শুভঙ্কর বলল, "কাজ। যে জন্য মাইনে পাই।"

অলকা চৌধুরী বলল, "কতক্ষণ চলবে?"

শুভঙ্কর বলল, "সারা দিন।"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, "লাঞ্চ খাবেন না?"

শুভঙ্কর জবাবে বলল, "খুব সম্ভব না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "কেন?"

শুভঙ্কর বলল, "শরীরটা ভালো নেই। তা ছাড়া টেবিলে কাজের পাহাড় জমেছে।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তা যাই হোক লাঞ্চ খাবেন। কাজ নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না। আমি একটা মন্ত্র জানি। তাতে কাজের পাহাড় উইয়ের ঢিবি হয়ে যায়।"

শুভঙ্করের হাসতে ইচ্ছা হল। পারল না।

অলকা চৌধুরী বলল, "আসবেন?"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়?"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমার এখানে।"

শুভঙ্কর বলল, "ক্লাবে?"

অলকা চৌধুরী মিথ্যে বলল, "ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

শুভঙ্কর রিসিভারটা শক্ত করে চেপে ধরল।

অলকা চৌধুরী বলল, "ক্লাবে নয়, হস্টেলে। হস্টেলে চলে আসুন।"

শুভঙ্কর বলল, "হস্টেলে? নিয়মে বাধবে না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "লাউঞ্জে যে কেউ আসতে পারে। নারীপুরুষে ভেদাভেদ নেই। রুমে আসতে গেলে নিয়মে আটকায়। তবে আমার বেলায় কোনো নিয়ম খাটানো হয় না। বেয়ারাকে বলে রাখছি। সোজা আমার স্যুইট-য়ে নিয়ে আসবে।"

শুভঙ্কর অলকা চৌধুরীর স্যুইট-য়ের বেল টিপবার সঙ্গে সঙ্গে কবাট খুলে গেল। অলকা চৌধুরী একপাশে একটু সরে গিয়ে বলল, "আসুন।"

শুভঙ্কর বসতে সে কোণাকুণি একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, "এখন কেমন আছেন?"

শুভঙ্কর বলল, "বিশেষ ভালো না।"

অলকা চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কী হয়েছে?"

শুভঙ্করের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বলল, "রাগ করেছেন ?"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "কার উপর ?"

অলকা চৌধুরী বলল, "কেন, আমার উপর।"

শুভঙ্কর বলল, "না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "হ্যাঁ। জানি রাগ করেছেন।"

শুভঙ্কর জবাব দেবে না বুঝে অলকা চৌধুরী বলল, "সেদিন আপনি কী কাণ্ড করলেন বলুন তো ! কেন ওভাবে চলে এলেন ?"

শুভঙ্কর বলল. "মনে হল আমি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করলাম।"

অলকা চৌধুরী ভ্রূ উঁচুতে তুলে বলল, "অসুবিধা ? কী অসুবিধা ? আপনি এতও বানাতে পারেন।" পরে বলল, "নাম ধরে ডাকলাম। রীতিমতো চেঁচালাম। বারান্দা দিয়ে ছুটে গেলাম। রাস্তার মোড় পর্যন্ত। একবার পিছন ফিরে পর্যন্ত তাকানো দরকার মনে করলেন না। গাড়ি হাঁকিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেন।"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিক এ কথা না হলেও, এ ধরনের কথা আমিও বলতে পারি।"

অলকা চৌধুরী বলল, "না। পারবেন না।"

অলকা চৌধুরী খানিকক্ষণ কোনো কথা বলল না। শুভঙ্কর তার দিকে একেবারেই তাকাচ্ছে না লক্ষ্য করে আহত বোধ করল। সেই সঙ্গে তার বুঝতে বাকী থাকল না শুভঙ্করও কোথাও একটা বিষম চোট খেয়েছে।

অলকা চৌধুরী বলল, "কিছু খাবেন ?"

শুভঙ্কর প্রবল বেগে মাথা নাড়ল।

অলকা চৌধুরী হাসল। বলল, "লাঞ্চ না খান, হালকা কিছু খান।" উঠে গিয়ে পাশের ঘরে রেফ্রিজারেটর থেকে দুটো স্যাণ্ডউইচ একটা প্লেটে সাজিয়ে, ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় কফি ঢেলে এনে

শুভঙ্করের সম্মুখে রাখল। বলল, "খান। আমি ভেবেচিন্তে আনিয়ে রেখেছি।"

শুভঙ্কর অলকা চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, "খেতে পারব না। শরীরটা সত্যিই ভালো নেই।"

অলকা চৌধুরী সোফা থেকে উঠে এসে একটা স্যাণ্ডউইচ শুভঙ্করের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "না খেয়ে কোথায় যান দেখি! ছুঁড়ে ফেলে দেবেন? ভীষণ খারাপ হবে বলছি।"

শুভঙ্কর স্যাণ্ডউইচ মুখে দিতে বাধ্য হল।

হঠাৎ অলকা চৌধুরী খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "আপনার এরকম ছেলেমানুষী আমার এত ভালো লাগে! আপনার জন্য কষ্ট পেয়েও সুখ।"

স্যাণ্ডউইচ শেষ করে স্বাভাবিক কারণেই হয়তো শুভঙ্কর কফির পেয়ালায় হাত দিতে দেরী করছিল। অলকা চৌধুরী পুনরায় উঠে এসে তার হাতে পেয়ালাটা তুলে দিল। বলল, "না খেলে খাইয়ে দেব। মনে ভাববো একটা বাচ্চাছেলেকে খাওয়াচ্ছি।" তার মুখ কোমল হয়ে এল। সেই মুহূর্তে শুভঙ্করের সহস্র নিষেধ অমান্য করে তার অভিমানের পাহাড়টা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

শুভঙ্করের মুখভাবে হয়তো তার ভিতরের ঘটনার ছাপ পড়ল। অলকা চৌধুরী লক্ষ্য করল। বলল, "শরীর সত্যিই কি খারাপ লাগছে?"

শুভঙ্কব মাথা নেড়ে বলতে গেল, "না।"

অলকা চৌধুরী একটা কুশান তুলে নিয়ে শুভঙ্করের পিছনে দিয়ে বলল, "একটু হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসুন তো। পাশের ঘরে একটু শুয়ে নেবেন?"

শুভঙ্করেব মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল, "শোবার ঘরে?"

অলকা চৌধুরী ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে বলল, "ছিঃ!" শুভঙ্করকে বিশেষ অপ্রস্তুত হতে দেখে বলল, "পাশের ঘরটা আমার স্টাডি। ওখানে একটা ডিভান আছে।"

অলকা চৌধুরী ভেবেছিল শুভঙ্কর তাড়াতাড়ি যেতে চাইবে। কিন্তু তার উঠবার কোনো লক্ষণই দেখল না। মনে হল শুভঙ্করের ঘর নেই। থাকলেও হারিয়েছে। সে সহজে নড়বে না।

অলকা চৌধুরীর মন ভরে উঠল। ভিতরে একটা সুমধুর বেদনার সাড়া পেল, বলল, "সেদিন আপনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। পথের ছেলেকে কোলে তুলে নিলে নিজের ছেলে পর হয়ে যায় না। আপনি আমার কত কাছে, কত আপন বুঝতে পারেন না?" তারপর ধরা গলায় বলল, "না, বোঝেন না।" শুভঙ্কর একবার তার দিকে তাকাতে বলল, "আপনি ভাবেন আমি বিক্রম শাকে ভালবাসি। ভুল করেন। ও লোকটা পথে ফেলে দেওয়া শিশুর মতো। জীবনে বারবার চেয়েও ভালবাসা পায় নি। অত্যন্ত একা। দুঃখী। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যদি ছলনাও করি, আপনাব গায়ে লাগে কেন? ওর সান্ত্বনা আপনার ক্লেশ হয় কেন?"

শুভঙ্কর নিজেকে চাপতে পারল না। বলল, "আমিও একা। বিক্রম শার চেয়েও একা। ওর চৌধুরী কাস্‌ল্‌ আছে। আমার কে আছে?"

অলকা চৌধুরী কাছে না এসে পারল না। শুভঙ্করের পাশে বসে তার দুহাত মুঠে করে ধরে বলল, "তোমার আমি আছি।"

কতক্ষণ তারা এভাবে পাশাপাশি বসে রইল তাদের হিসেব রইল না। ঘরে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসতে তাদের খেয়াল হল।

শুভঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "অলকা! চলো আমরা দুজনে পালিয়ে যাই। দূরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতি।"

অলকা চৌধুরী ভ্রূভঙ্গি করে বলল, "পালাতে যাবো কেন? আমি রাজার মেয়ে। আমার পথ আটকায় কে? নিউ দিল্লী সরগরম করে ঘটা করে ধুমধামে বিয়ে করব।"

শুভঙ্কর অফিসের গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় অলকা চৌধুরীর টুসীটারে দুজন যমুনার ধারে গেল। দুজনে হাত ধরে যমুনার স্নিগ্ধ অন্ধকারে দুটি মানুষের ভিতরের ব্যবধান বারবার পার হল। এ ঘটনায় বিস্মিত হয়ে তারা বারবার অন্ধকারেই পরস্পরকে দেখার চেষ্টা করল। অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যে কী দুর্লভ অভিজ্ঞতা এ কথা চিন্তা করে একবার তাদের জাফরীর আড়ালের অন্ধকারবাসিনী অসূর্যম্পশ্যা মহারানীর কথা মনে হল।

শুভঙ্কর কাস্‌ল্‌য়ে ফিরে বিক্রম শা-র অফিসের পাশ দিয়ে আসছিল। বিক্রম শা ত্রস্তপদে বার হয়ে এসে প্রায় পথরোধ করে বললেন, "মিস্টার ঘোষ!"

শুভঙ্কর বিস্মিত হল।

বিক্রম শা চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, "মিস্টার ঘোষ! কাল থেকেই একটা কথা ভাবছি। যদি দু মিনিট সময় দেন তো বলি।"

শুভঙ্কর বিব্রত বোধ করল। বিক্রম শা কোন্ বিষয়ের উল্লেখ করতে যাচ্ছেন বুঝতে দেরী হয় না। বলল, "কালকের ব্যাপারটা ভুলে যান। হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া কিছু নয়।"

বিক্রম শা বললেন, "কালকের ব্যাপারে যদিও আমি বিশেষ দুঃখিত, তবু ও ব্যাপারটা আমি সহজেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি। পেরেছিও। আমি সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয়ে একটা অনুরোধ করতে চাই।"

শুভঙ্কর বলল, "বলুন।"

বিক্রম শা বললেন, "মিস্টার ঘোষ! আমি গোড়া থেকেই আপনাকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছি। কারণ বলতে পারি না। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে যদি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি।"

শুভঙ্কর বিক্রম শাকে বুঝল না। তবু না বলে পারল না, "জানি।"

বিক্রম শার মুখ উজ্জ্বল হল। বললেন, "মনের এ ভাবটা কিছু-দিন ধরে চৌধুরী কাস্‌ল্-এর প্রায় সকলের সম্বন্ধেই প্রবল হয়ে উঠছে বুঝতে পারি। কিন্তু আপনার কথাই বেশী মনে হচ্ছে।" আত্ম-বিস্মৃতের মতো ফিসফাস করে বললেন, "মহারানীর ও মিস চৌধুরীর কথাও।" বিক্রম শা নীরব হলেন। গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেলেন।

শুভঙ্কর যখন অতিথি মহলের দিকে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, বিক্রম শা তাঁর আকস্মিক ধ্যান থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, "কারণটা নিজেও স্পষ্ট বুঝছি না। কিন্তু নিজের একটা হিসেব-নিকেশ করার জোর তাগিদ পাচ্ছি। যদি যাবার সময় কারো বিপদে কারো প্রয়োজনে নিজেকে বিসর্জন দিতে পারি, হিসেবটা মনোমত হয়। প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করতে ভুলবেন না। অনুরোধ রইল।"

শুভঙ্কর বিক্রম শা-র কথার কারণ ও তাৎপর্য না বুঝেও অভিভূত হল। বিক্রম শা-র প্রসারিত হাত শক্ত করে চেপে বলল, "না। ভুলবো না।"

যেতে যেতে শুভঙ্কর একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বিক্রম শা তখনো অফিসে ঢোকেন নি। তাঁর সেদিনের চিন্তায়ই হয়তো আচ্ছন্ন, নিশ্চল।

কিছুক্ষণ পর বিক্রম শা ঘরে ঢুকলেন। দুখানা চিঠি লিখলেন। একখানা মহারানীকে একখানা অলকা চৌধুরীকে। চিঠির মর্ম, যাবার আগে তিনি কিছু করে যেতে চান। নিজের লাভ লোকসানের কথা না ভেবে। তা হলে একটা বড় হিসেবে তাঁর লাভের অঙ্কটা ভারী হয়।

পরদিন অফিসে কাজের ব্যস্ততার ভিতর দশটাতক টেলিফোনের

রিসিভারটা তুলতে হল। জাহানারার গলা। রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে পারল না।

জাহানারা বলল, "একবার আসতে পারেন ?"

শুভঙ্কর বলল, "কেন ?"

জাহানারা বলল, "জরুরী কথা আছে।"

শুভঙ্কর বলল, "এত কাজ জমেছে—"

জাহানারা বলল, "বেশী সময় নেব না।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু—"

জাহানারা বলল, "অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য আসুন।"

শুভঙ্কর বিপন্ন বোধ করল। মনের সকল শক্তি সঞ্চয় করে বলল, "পারছি না।"

জাহানারা ক্ষুণ্ণস্বরে বলল, "আসবেন না ?"

শুভঙ্কর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "না।"

জাহানারা প্রতিটি কথা শুভঙ্করের মনে বিঁধিয়ে দিয়ে বলল, "আজ না হলেও কাল আসতে হবে। না এসে পারবেন না।"

শুভঙ্কর প্রতিবাদ করে কী বলতে যাচ্ছিল। টেলিফোনে জাহানারা হাসছে শুনল। তার রক্ত জমে গেল। একটা অদ্ভুত আশঙ্কাও হঠাৎ ফণা তুলে তাব মনের একটা অন্ধকার কোণে দুলে উঠল।

রিসিভারটা রেখে কাজে মন দিতে যাবে, একটা ফাইল সামনে টেনে নিয়েছে, আবার টেলিফোন বেজে উঠল। জাহানারা বলল, "গরজ বড় দায়। লজ্জার মাথা খেয়ে আবার কথা বলতে হচ্ছে। যা বলা উচিত নয়, বলেছি। মাপ করবেন।"

শুভঙ্কর যুগপৎ স্তম্ভিত ও ভীত হল।

জাহানারা বলল, "আপনি এখানে না এলেন। আর কোথাও দেখা হতে পারে ?" শুভঙ্কর সাড়া না দেওয়াতে বলল, "ধরুন, আপনার অফিসে !"

শুভঙ্কর প্রায় ঘেমে উঠল। বলল, "না, না।"

জাহানারা বলল, "পাঁচ মিনিটও সময় নেব না। দু'কথায় কথা সেরে চলে আসবো।"

শুভঙ্কর বলল, "কে দেখবে, কী ভাববে! দুচারদিন বাদে বরং—"

জাহানারা বলল, "দেরী করা সম্ভব হলে এভাবে টেলিফোন করি?"

শুভঙ্কর আমতা আমতা করে বলল, "কিছু মনে করবেন না—"

টেলিফোন কেটে গেল।

পনেরো মিনিট না যেতেই রিসিভার তুলতে হল। মহারানীর পরিচিত কণ্ঠস্বর। বিস্ময়কর ঘটনা। রানীমহলের টেলিফোন দৃষ্টিশোভা। ক্কচিৎ বাজে। হঠাৎ সেই টেলিফোন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ শুভঙ্কর নিজে। সে বিশেষ বিচলিত হল।

মহারানী বললেন, "টেলিফোনে বেশী কথা বলব না। আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম। যতদিন পর্যন্ত আপনি হ্যাঁ না কোনো উত্তর দিচ্ছেন, আপনি মুক্ত নন। এ অবস্থায় কোনো নতুন বন্ধনে জড়ানো উচিত হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ হবে। আমার উপদেশ মেনে চললে একাধিক বিপদ এড়াতে পারবেন।"

শুভঙ্করের গলা শুকিয়ে এসেছিল। ইচ্ছা থাকলেও সে কোনো জবাব দিতে পারত না। খুট করে একটা শব্দ হল। শুভঙ্কর বুঝলো মহারানী টেলিফোন রেখে দিলেন।

শুভঙ্কর ফাইলটা একপাশে সরিয়ে রেখে চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসল। একটা কঠিন দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরল। মহারানী কী জানেন? কতটুকু জানেন? কারণ কি অলকা? জাহানারা? না দুজনই?

তার কয়েক মিনিট বাদেই যখন আবার টেলিফোন বাজল

শুভঙ্কর প্রথম ধরল না। বারবার বাজতে রিসিভারটা তুলতে হল। অপারেটর জিজ্ঞাসা করল, "স্যর! আপনার লাইনটা ঠিক আছে তো?" শুভঙ্কর জবাব দিল, "ডোণ্ট উওরি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম। শুনতে পাই নি।"

রিসিভার কানে তুলতেই আমেদের গলার দাপটে তার কান কেঁপে উঠল। আমেদ বলল, "ব্যাপাব কি? কোন্ দিবাস্বপ্নে তন্ময় হয়ে রয়েছো?"

শুভঙ্কর বলল, "দুঃস্বপ্নে।"

আমেদ বলল, "এতদিনে মনুষ্য জীবনের প্রকৃত স্বাদ পাচ্ছ।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি বিপন্ন। বিহ্বল। তোমার রসিকতায় সাড়া দিতে পাবছি না।"

আমেদ বলল, "কী বিপদ শুনি।"

শুভঙ্কব বলল, "টেলিফোনে বলা চলে না। সাক্ষাৎ মতো কথা বলতে চাই।"

টেলিফোনটা হঠাৎ যেন মূক হয়ে গেল। কয়েকটা দীর্ঘ নিঃশব্দ মুহূর্ত। শুভঙ্কব অপাবেটবকে ডাকতে যাচ্ছিল। সেই সময় আমেদের গলা শোনা গেল, "আজ আমাব আবির্ভাব-কেন্দ্র পুবনো দিল্লীব কবোনেশন হোটেল। সন্ধ্যা সাতটায়।"

কবোনেশন হোটেলে আমেদ একটা সেকেলে কেতায় সাজানো ঘরে বসে ছিল। পুরনো ভারী সিল্কের পর্দা। ততোধিক পুরনো কার্পেট। টেবিলে চেয়ারে বাদশাহী আমলের গন্ধ। চেয়ারগুলো সিংহাসনের নিখুঁত নকল।

আমেদ একটা চেয়ারে প্রায় নিশ্চল অবস্থায় বসে। আমেদের দিকে তাকাতে শুভঙ্করের মনে হল সে অনেক দূর থেকে তাকে দেখছে। এ আমেদ তার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নূতন। হাস্যে শ্লেষে উজ্জ্বল চিরপরিচিত আমেদের সঙ্গে কোনো মিল নেই।

আমেদেব কণ্ঠও যেন অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। গভীর, গম্ভীর।

আমেদ খানিক তফাতে একটা চেয়াব দেখিয়ে শুভঙ্কবকে বসতে বলল। শান্তকণ্ঠে বলল, "কী বিপদ বলো।"

শুভঙ্কর বলল, "আমাব গোড়ার সমস্যা তুমি জানো। তার সঙ্গে আব একটি সমস্যা যুক্ত হয়েছে। তাব জন্য দায়ী অনেকটা তুমি।"

আমেদ হাসল। বলল, "জাহানাবা?"

শুভঙ্কব বলল, "হ্যাঁ।"

আমেদ বলল, "সমস্যা জীবনেব অত্যন্ত নিরীহ ঘটনা। সমাধানেব সঙ্গে সঙ্গেই সবে পড়ে।"

শুভঙ্কব বলল, "সমাধান কি শুধু আমাব হাতে?"

আমেদ বলল, "অনেকটা। তুমি যদি নিজেব জোবে সমাধান করে নাও, ঠেকায কে?"

শুভঙ্কব বলল, "আমাব সমাধান যদি তাদেব মনঃপূত না হয়?"

আমেদ বলল, "তাবা তাদের সমস্যা নিযে ভুগবে। তুমি মুক্ত।"

শুভঙ্কব বলল, "আমাব অবস্থা আনাড়ী ভূ-আবিষ্কাবকেব মতো। তিন দিকে তিনটে পথ। কোন্ পথ ধরি?"

আমেদ বলল, "আনাড়ী যদি নিতান্ত অজ্ঞও হয তা হলে যে পথ ভাল লাগে সে পথে চলবে। যদি আনাড়ী হওযা সত্ত্বেও বিজ্ঞ হয় বিচাব কবে দেখবে। যদি কোনো মীমাংসায না আসতে পাবে তা হলে চতুর্থ পথ বেছে নেবে।"

শুভঙ্কব বলল, "চতুর্থ বলতে তুমি কী বুঝছ?"

আমেদ বলল, "ফিবে যাবার পথ। তিন পথেব কোনো একটি বেছে নিতে না পাবলে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিবে যাবে। ঘোষ! তুমি তল্পিতল্পা গুটিয়ে একদিন ঘবেব ছেলে ঘরে অর্থাৎ কলকাতায় ফিবে গেলে কে বাধা দেবে?"

শুভঙ্কর শুষ্কস্বরে বলল, "আমি তা চাই না আমেদ। ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। স্পষ্ট জবাব দিও। আমার সমস্যা সম্বন্ধে তুমি প্রথমে আমাকে অভয় দিয়েছিলে। পরে এক কথাই বলে এসেছ 'ঘটনা ঘটতে দাও। ঘটনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কোরো না'। তোমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আমি নিজের জীবনে ঘোর বিপদ ডেকে এনেছি। এখন তুমি যদি আমাকে শক্ত ডাঙ্গায় দাঁড়াতে না দাও ঘটনাস্রোতে ভেসে যাবো। হারিয়ে যাবো।"

আমেদ গম্ভীর স্বরে বলল, 'বলতে পারতাম নিজের কথা অত ভাবো কেন? তাতে জীবনের কী লাভ? তা ছাড়া হারিয়ে গেলে কোনো একটা কারণের মতো কারণেই হারাবে। দেয়ালীর রাতের পোকার মতো নয়। কিন্তু আমি তোমাকে ও কথা বলব না। আমি অভয় দিয়েছিলাম। এখনো দিচ্ছি। আমার উপব নির্ভর করো। প্রচণ্ড আঘাতের জন্য তৈবী হও। ফলাফল আমার হাতে ছেড়ে দাও। মায়ের জঠরে দশ মাস অন্ধকারে অপেক্ষা কবেছিলে। কোনো আপত্তি করো নি। এই ক'টা দিনে এত অধীর হলে চলবে কেন?"

শুভঙ্কর আমেদের কথার উত্তরে কী বলবে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে উঠতে পারল না। আমেদের হাবেভাবে কথায় তার মনে হতাশার অনুরূপ একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবু নিরুপায় হয়ে সে বলল, "আমেদ! অলকার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য দুদিক থেকে দুজন হাত বাড়িয়েছে। স্বর্গ ও নরক থেকে এক সঙ্গে। আমি অলকাকে হারাতে চাই না।"

আমেদ বলল, "কে হারাতে বলে?"

শুভঙ্কর বলল, "আমার বুদ্ধি ঠিক নেই। মন দুর্বল। শরীরও ভেঙে পড়ছে। আমি নিজের শক্তিতে আস্থা রাখতে পারছি না।"

আমেদ হেসে বলল, "অতিথিমহলের কচি পাঁঠা! যতদিন বলির

আশা থাকবে, তোমার মুখের ঘাস কার সাধ্য কাড়ে। তুমি যেমন নধর পুষ্ট ছিলে তেমনি থাকবে।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার কথায় তোমার পরিহাসে তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার খোলসটাই শুধু দেখছি। কিন্তু তোমার সেদিনের সেই স্নিগ্ধ প্রীতি, করুণা, মমতার এক তিলও অবশিষ্ট নেই।"

আমেদ হাসল। সুদূর আকাশের উদাসী হাসি। বলল, "বন্ধু! আমাকে কুরুক্ষেত্রের জন্য তৈরী হতে হচ্ছে। খোল নলচে বদলাতে হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। তোমাকে রক্ষা করার জন্য অলক্ষ্যে সারথী সেজে রথ চালাবো। ঘটনার জন্য তৈরী হও। বুঝতে পারবে। আর দেরী নেই।"

শুভঙ্কর উঠতে যাচ্ছিল। আমেদ ইঙ্গিতে বসতে বলল। জিজ্ঞাসা করল, "মুস্তাফার নাম শুনেছ?"

শুভঙ্কর বলল, "লোকমুখে। বইয়েও পড়েছি। কতদূর সত্য জানি না, শুনেছি মহারানীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।"

আমেদের মুখ অন্ধকার হল। কিন্তু তারপরই সে বলল, "ঘোষ! তুমি চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর দাবাখেলায় বোড়ে হয়ে লেজ গুটিয়ে কাঁপছ। কিন্তু মুস্তাফা মরে নি। সে শুধু বেঁচে নেই, সে নিউ দিল্লীতে। তুমি তার হাতের কিস্তির বোড়ে। তোমাকে চেলে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর খেলায় সে মহারানীকে মাত করবে।"

মুস্তাফা? বিস্ময় বিহ্বল শুভঙ্করকে সম্বোধন করে আমেদ বলল, "ঘোষ! চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর বর্তমান পালায় মুস্তাফা এসে যোগ দিয়েছে। এখন কোনো অঘটনই অসম্ভব নয়।"

শুভঙ্কর করোনেশন হোটেল থেকে বার হয়ে পুরোনো দিল্লীর জনযানবহুল সংকীর্ণ রাস্তায় চিন্তাকুল মনে তার গাড়ির দিকে এগোলো। একটা সত্য সে রাতে সে উপলব্ধি করল। মানুষের জীবনের সমান্তরাল আর একটি জীবন কল্পনা নয়। কঠোর বাস্তব।

এই দ্বিতীয় বাস্তব মানুষই তার অগোচর মনে নিজহাতে তৈরী করে। অদৃষ্ট সহযোগী মাত্র।

আমেদেব সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুভঙ্কর সোজা কাস্‌ল্‌য়ে ফিরতে পারল না। চেষ্টা করলেও পারত না। এদিকে ওদিকে গাড়ি হাঁকিয়ে সে বারবার অলকা চৌধুরীর হস্টেলের বাস্তার চৌমাথায় পৌছল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে নিজের সঙ্গে যুঝবার পর সে বুঝল হয় অলকা চৌধুরী নয় তাদের দুজনের অদৃষ্ট তাকে অলকা চৌধুবীর হস্টেলের দিকে আকর্ষণ কবছে।

অলকা চৌধুরী নয়। তাদের অদৃষ্ট। অলকা চৌধুরী তো আগের দিন স্পষ্টভাষায় ও স্পষ্টতর আচরণে তাব শেষ কথা বলে দিয়েছে। তারপর তার কোনো নতুন কথা থাকতে পারে না। থাকতে পারে তাদের অদৃষ্টের। এ কথা সে একা শুনতে চায় না। যদি কথা অদৃষ্ট তার মুখ দিয়েই বলে, অলকা চৌধুরীর সাক্ষাতেই সে কথা সে নিজমুখে শুনতে চায়। অলকা চৌধুরীকে পাশে না পেলে এ কথা শোনার সাহস তার নেই।

শুভঙ্কব খবব পাঠাতে হস্টেলের নিয়ম ভেঙেই অলকা চৌধুবী শুভঙ্করকে তার ঘরে আসতে বলল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, "বেশী সময় নেবেন না মিস্টার ঘোষ। আমারও উপরয়ালা আছেন! বুঝতেহ তো পারেন!" সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কথা শুভঙ্করের কানে ঢুকল কিনা সন্দেহ। সে বেয়ারার পিছু পিছু দোতলায় অলকা চৌধুরীর ঘবের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

কপাট খুলতে মিনিট দুয়েক দেরী হল। শুভঙ্কর উদ্বিগ্ন হল। প্রথম দশ সেকেণ্ডের পর প্রতি সেকেণ্ডে তার উদ্বেগ বেড়ে চলল।

অলকা চৌধুরী কপাট খুলতে সে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অলকা চৌধুরী হাসবার চেষ্টা করল। বলল, "এসো। এসো। এত রাতে?"

শুভঙ্কর দেখল অলকা চৌধুরীর চোখে জল।

অলকা চৌধুরী বডিসের তলা থেকে রুমাল বার করে এনে চোখে চেপে ধরে বলল, "ভিতরে এসো। দাঁড়িয়ে কেন?"

শুভঙ্কর ভিতরে আসতে অলকা চৌধুরী তাকে বসতে বলে কপাট বন্ধ করল। বলল, "আমি সারাটা দিন মন খারাপ করে রয়েছি। তুমি এসে ভালো করেছ। কিন্তু তোমার মুখ কালো কেন? কী হয়েছে?"

শুভঙ্কর তখন রীতিমতো চিন্তা করতে শুরু করেছে। মনে মনে বলল, "অলকা! তোমার কী হয়েছে? তোমারই বা চোখে জল কেন?" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে যে কথা পাড়বে ভেবেছিল, চেপে দেবার চেষ্টা করল। বলল, "মনটা আমারও ভালো নয়। হঠাৎ ইচ্ছা হল। চলে এলাম। এঃ অসময়ে এসে পড়েছি, খেয়ালই ছিল না।"

অলকা চৌধুরী একটু হেসে বলল, "বেশ করেছ। তোমার বেলায় আবার সময় অসময় কী?"

শুভঙ্কর বলল, "আমাদের দুজনেরই দেখছি মন খারাপ। কথাটা না হয় আজ নাই বললাম।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তাহলে এখানে আসার ইচ্ছে হঠাৎ হয় নি। কোনো জরুরী কারণ আছে। সে জন্যেই তোমার আজ সময় অসময়ের জ্ঞান নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "কী করে কথাটা পাড়ব ভেবে পাচ্ছি না।"

অলকা চৌধুরী বলল, "তা হলে ভাবতে থাকো। আমি ততক্ষণ কফির ব্যবস্থা করি।"

কোনো রকমে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে রেফ্রিজারেটর থেকে কফির টিন বার করতে গিয়ে অলকা চৌধুরী টের পেল তার শরীর কাঁপছে। তার নিজের উপর রাগ হল। কেন সে এত অসহায় বোধ করছে? মহারানী টেলিফোন করেছেন, তারপর পুরো বারো ঘণ্টা কেটেছে।

সে এখনো মহারানীর কয়েকটা কথার সামনে কেঁপে মরছে! তার শরীরে কি চৌধুরী বংশের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে? অন্য সবাই মহারানীর ভয়ে মূর্চ্ছা যেতে পারে। কিন্তু সে অলকা চৌধুরী। মহারানী ও সে এক মায়ের পেটের বোন। মহারানীকে তার এত ভয় পেলে চলবে কেন? এই কেনর উত্তর ভয়ঙ্কর। ভয় তার নিজের জন্য নয়। সেও মহারানীর চেয়ে দম্ভে কম যায় না। প্রমাণের প্রয়োজন হলে সে কী না করতে পারে! এখনই কাস্‌লুয়ে হানা দিয়ে মহারানীর দরবার ঘরের জাফরীটা চুরমার করে দিতে পারে। অতিথিমহলের রহস্যচারিণীর মুখের রেশমী জাল একটানে খুলে দিতে পারে। পারে না বলে যে পারে না, তা নয়। পাছে কোপটা তাঁর উপর না পড়ে শুভঙ্করের উপর পড়ে এই ভয় তাকে পিছনে টেনে রাখে।

মহারানী টেলিফোনে বলেছেন, "অলকা! অতিথিকে নিয়ে এখন মামুলী জোর খাটাবার সময় নয়। সে সাধনায় এসে গিয়েছে। না হলেও এসে গেল বলে। তাকে নিয়ে টানাটানি করে নিজের বিপদ ডেকে এনো না।"

অলকা চৌধুরী বলতে পারত, "অতিথি মহলের খেলায় এই মামুলী জোর খাটানো আইনে আটকায় না।" কিন্তু এ কথা সে বলে নি। শুভঙ্করকে নিয়ে তার যত ভয়। শুভঙ্কর কোনরকমে যদি ফাঁদে জড়িয়ে থাকে, এরপর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো হবে। কী ভাবে, কী করে, জানে না বলেই এই ভয় এত ভয়ঙ্কর।

মহারানী টেলিফোনে শেষে বলেছেন, "তুমি আমার আপন বোন বলে অনেক ব্যাপারেই তোমার সাতখুন মাপ। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে নয়। আমার সাধনা তোমার আমার চেয়ে অনেক বড়।"

মহারানী যখন কথা বলেন তখন মনে হয় না একটি মানুষ কথা বলছে। একটা অচেনা আকাশ, একটা অচেনা মহাদেশ যেন কথা বলে। অতর্কিতে তাঁকে তৈরী হতে না দিয়ে কথা বলা চলে।

যুক্তির জোর খাটানো চলে না। একদিন যেমন সে মাঝরাতে চড়াও হয়ে গিয়ে কতগুলো কথা বলে এসেছিল। কিন্তু তৈরী হবার সময় পেলে মহারানী এক অদ্ভুত শক্তিতে কথা বলার পথ বন্ধ করে দেন। তাঁর জানা এক জোড়া অদৃশ্য কপাট আছে। সেই কপাট তাঁর ইচ্ছায় বন্ধ হয়, খোলে। সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায়। অলকা চৌধুরীকেও আজ যে করে হোক এক জোড়া অদৃশ্য কপাট আবিষ্কার করতে হবে। এই কপাটের সামনে সে পাহারা দেবে। সাহসে বুক বাঁধতে হবে। এই কপাটের ওধারে থাকবে শুভঙ্কর। অলকা চৌধুরীর জীবনের সুরক্ষিত কক্ষে।

অলকা চৌধুরী কফির পেয়ালা হাতে ফিরে এসে দেখল শুভঙ্কর তখনো চিন্তায় তন্ময়। পেয়ালা টিপয়ে নামিয়ে রেখে বসতে বসতে অলকা চৌধুরী বলল, "বলো কী ভাবছ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমাদের কথা।"

অলকা চৌধুরী বলল, "আমাদের মানে তোমার?"

শুভঙ্কর আহত স্বরে বলল, "আমার। কিন্তু আমার কথা কি তোমারও নয়?"

অলকা চৌধুরী ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করল, "মহারানী টেলিফোন করেছিলেন বুঝি?"

শুভঙ্কর সবিস্ময়ে বলল, "কী করে বুঝলে?"

অলকা চৌধুরী শান্তকণ্ঠে বলল, "আমাকেও করেছিলেন! ঐ টেলিফোনের কথা এতক্ষণ ভেবেছি। কিন্তু আর ভাববো না। আমাদের মহারানীকে নিয়ে দুর্ভাবনা করার যুগ কেটে গিয়েছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার দুশ্চিন্তা আমার জন্য ততটা নয়, যতটা তোমার জন্য।"

অলকা চৌধুরী বলল, "অর্থাৎ"—

শুভঙ্কর বলল, "মহারানী যদি জোর খাটান, আমার যাই হোক, সেই সঙ্গে তুমিও ভুগবে।"

অলকা চৌধুরী জেগে উঠল। তার গলায় মহারানীর গলার স্বর বাজল। বলল, "তোমার কী হবে শুভঙ্কর? মহারানীর টানে নোঙর ছিঁড়ে ভেসে যাবে? যদি যেতে চাও পাল তুলে নিজের জোরে যাও। অসহায়ের মতো যেয়ো না।"

শুভঙ্কর বলল, "কাস্‌ল্‌-এর বাইরে আমি সহজ স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু কাস্‌ল্‌-য়ে ঢোকার পর, বিশেষ করে অতিথি মহলে টের পাই একটা শক্তি আমাকে ঘিরে ধরে। সূক্ষ্মদেহে আমার ভিতরে ঢুকতে থাকে। তখন আমি আর এক মানুষ। আমার অনুভূতি, সংস্কার, বৃত্তি কিছুই আমার নয়। আমাকে যুক্তির জোরে টিকে থাকতে হয়। কিন্তু এ জোর কতটুকু?" একটু থেমে বলল, আজকাল কাস্‌ল্‌-এর বাইরেও এই শক্তি আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। সন্ধ্যা-রাত হলেই যেখানেই থাকি না কেন টানতে থাকে। এ যে কী টান তোমাকে বোঝাতে পারি না, অলকা।"

অলকা চৌধুরী বলল, "কিন্তু আজ তুমি এতরাতে আর এক টানে এখানে এসেছ।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু তুমি মহারানী নও। তোমাকে বুঝতে পারি। তুমি আমার চেয়ে অনেক শক্ত। কিন্তু আমারই মতো। আমি জানি, বুঝতে পারি ঐ টেলিফোনে তিনি কী বলেছেন। তুমি হলে বলতে পারতে না কারণ তুমি মহারানী নও। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের উর্ধ্বে নও। অলকা! আমি তোমার জন্য ভয় পাই। মহারানীর পথরোধ করতে গিয়ে তোমার ক্ষতির কারণ না হই। আমার কিছু হলে তুমি ভেবে ভেবে শেষ হবে।"

অলকা চৌধুরী ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল, "কী হতে পারে?"

শুভঙ্কর বলল, "আমার এক বন্ধুর কাকার কথা মনে পড়ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর তুল্য মেধাবী ছাত্র খুবই কম ছিল। তিনি এক গুরুর পাল্লায় পড়ে আফিং ধরলেন। শেষে গুরু ছাড়লেন কিন্তু আফিং ছাড়তে পারলেন না। প্রতিদিন সকালে সংকল্প

করতেন আর নয়। মুখে ছোঁয়ানো দূরের কথা আফিং নামটা মনে আসতে দেবেন না। কিন্তু প্রতিদিনই আফিংয়ের সময় হলেই চঞ্চল হয়ে পড়তেন। নেশার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য শহর তোলপাড় করে বেড়াতেন। যে অঞ্চলে যে পল্লীতে কখনো যান নি, যেতেন। নিজে ক্লান্ত হয়ে যদি ক্লান্তির চাপে নেশা পিষে ফেলতে পারেন। শেষে প্রতিদিনই অবসন্ন দেহে আফিংয়ের আড্ডায় গিয়ে নেশার কাছে আত্মসমর্পণ করতেন।"

অলকা চৌধুরী বলল, "শুভঙ্কর! আমি রাজার মেয়ে। চোখের জল ফেলেছি বলে কারো ভয়ে, সে ভয় যত ভয়ঙ্করই হোক, পথের ধূলোয় মিশে যেতে রাজী নই। আমি ঠিক আছি। ঠিক থাকব। কিন্তু তোমার কাছ থেকে জবাব চাই। জানতে চাই তুমি কতটা ঠিক আছো। ওঠো।"

শুভঙ্কর বলল, "আমাব কথা এখনো শেষ হয় নি।"

অলকা চৌধুরী বলল, "জানি। সে জন্যই তোমাকে উঠতে বলছি। তোমার কথা এখানে শেষ হবে না। যেখানে তোমার সত্যিকাবের কথা শোনা সম্ভব, তোমার মুখ থেকে আমার কথার জবাব পাওয়া সম্ভব, সেখানে চলো।"

শুভঙ্কব জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

অলকা চৌধুবী শুভঙ্কবের প্রশ্ন কানে না তুলে বলল, "আমি একটা হালকা কোট পরে নি। এক মিনিটও সময় নেব না।"

সারাপথ দুজনের ভিতর কোনো কথা হল না। পুরোনো কেল্লাব সামনে এসে গাড়ি বেঁধে অলকা চৌধুরী শুভঙ্করকে বলল, "নামো।"

শুভঙ্কর বিহ্বল কণ্ঠে বলল, "এখানে?"

অলকা চৌধুরী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কী একটা জিনিস অলক্ষ্যে বার করে নিয়ে কোটের পকেটে পুরে বলল, "চলো।"

শুভঙ্কর বুঝল প্রশ্ন করা বৃথা। সে নীরবে অলকা চৌধুরীকে অনুসরণ করল। কেল্লার মুখের কাছে এসে অলকা চৌধুরী বলল, "শুভঙ্কর। কথায় তোমার জবাব ছলে বলে কৌশলে আদায় করতে পারি নি। আজ অন্য পথ ধরতে হল। এই কেল্লায় আজ জবাব পেয়ে যাবো। এগোও।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "আমি? একা?"

অলকা চৌধুরী বলল, "হ্যাঁ। একা। তুমি যাবে। গিয়ে সামনের ঐ ভাঙা দেয়ালের উপর উঠবে। আমি প্রতীক্ষায় থাকবো।"

শুভঙ্কর বলল, "পুরোনো কেল্লায়—এই অন্ধকারে!"

অলকা চৌধুরী বলল, "পথ অস্পষ্ট হলেও চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে।"

শুভঙ্কর বলল, "কেল্লার ভিতর দিনের আলোয়ও আসি নি। এই অন্ধকারে—"

অলকা চৌধুরী বলল, "শুভঙ্কর! অন্ধকাব ও বহস্য একই জিনিস। কেউ শূন্য নয়। জবাব তাদের ভিতরই আছে। রহস্যকে ভয় করলে রহস্যকে বিকৃত করা হয়। সে হয়ে পড়ে মনের কূট ব্যাধি। সাহসে ভব করে এগিয়ে যাও, রহস্যেব মুখ থেকে পর্দা সরাতে পারলে রহস্য দেয় দিব্যজ্ঞান। পর্দা সবাতে নাও যদি পারো, ক্ষতি নেই। সাহসে ভর করে আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে জীবনের সব চেয়ে বড় কবিতা।"

শুভঙ্কর পুরোনো কেল্লার বিশাল মুখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল।

অলকা চৌধুরী বলল, "শুঁয়োপোকার তত্ত্বটা মহারানীর মাথায় প্রথম এলেও ওটা এখন আর শুধু তাঁর তত্ত্ব নয়, আমারও। তুমি একা কেল্লায় ঢুকবে, তোমার আমার দুজনের জোরে। হোঁচট খাও ক্ষতি নেই। উঠতে গিয়ে পা ফস্কে যায় গ্রাহ্য কোরো না। ঐ

দেয়ালের উপর তোমায় দেখতে চাই। জবাব শুধু আমি পাবো না। মহারানীও।"

শুভঙ্কর স্তম্ভিত। নিশ্চল।

অলকা চৌধুরী কোটের পকেট থেকে পিস্তল বার করে আনল। নিজের কপালে স্পর্শ করিয়ে বলল, "যাও। জবাব দাও। না হলে এই পিস্তলের গুলি আমার ললাট ভেদ করে তোমাকে আমার জবাব দেবে।"

শুভঙ্কর কেল্লার মুখে এগোলো। অল্পক্ষণ পরে অদৃশ্য হল। প্রতি সেকেণ্ড অলকা চৌধুরীর কাছে একটা যুগ মনে হল। এই প্রতীক্ষা তার দুঃসহ ঠেকল। কিন্তু সে শুভঙ্করকে জবাবের জন্য বিপদের মুখে পাঠিয়েছে। তার প্রতীক্ষায় না থেকে উপায় নেই। শুভঙ্করের নাম ধরে চেঁচাতে ইচ্ছা হল। প্রাণপণ করে নিজেকে সংযত করল। আকাশে চাঁদের ক্ষীণ রেখা ফুটল। দেয়ালের উপরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কী? দেয়ালের পিছনের আকাশ নয়। সে রাতের নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্য। শুভঙ্কর ধীরে ধীরে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে দেয়ালে উঠেছে। তার মাথায় এক ফালি চাঁদ। একটা পটে আঁকা ছবির মতো সে স্থির, অবিচল।

অলকা চৌধুরী হঠাৎ পুরোনো কেল্লার মাঠে তার দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। হাসিকান্নায় ভেঙে পড়ে আনন্দে অহঙ্কারে অধীর হয়ে সে চেঁচাল, "শুভঙ্কর!"

শুভঙ্করকে টেলিফোন করেই জাহানারা মহারানীকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করেছিল। বিক্রম শা-র গণ্ডি পার হয়ে মহারানী পর্যন্ত পৌছনো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও মিনিট তিনেকের ভিতরই মহারানীকে পেল।

জাহানারা বলল, "দ্বিতীয় দফায় কতদূর এগিয়েছি জানো। এখন তো রীতিমতো বেঁকে বসেছে। আজ একটু আগে দু দুবার টেলিফোন

করেও পথে আনতে পারলাম না। অফিসের বেয়ারার কাছ থেকে জানলাম কাল একটার আগেই অফিস থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল। অলকার হস্টেলের বেয়ারার কাছ থেকে যা শুনলাম দুপুর বিকেল এক সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যায় অলকার টু সীটারে করে দুজনে বেড়িয়েছিল। অলকা বেশ রাত করে হস্টেলে ফিরেছিল।”

মহারানী বললেন, “যে ভাবে পারিস শুভঙ্করকে জড়া। একটা বড় রকমের ধাক্কা না খেলে অলকার মন শুভঙ্করের ওপর থেকে সরানো যাবে না।” বলতে মহারানীর রুচি ও সংস্কারে বেঁধেও বাঁধল না। তিনি অনন্যোপায়।

জাহানারা হতাশ স্বরে বলল, “কী করে কী করি? অফিসে পর্যন্ত যেতে চাইলাম। তাতেও রাজী নয়।”

মহারানী উত্তেজিত স্বরে বললেন, “স্থান কালের কথা ভাবলে চলবে না। যে ভাবে হোক—”

জাহানারা বলল, “তা ছাড়া আমারও ভালো ঠেকছে না। ভিতর থেকে বাধা পাচ্ছি। শুভঙ্করের কথা আলাদা। কিন্তু শত হলেও অলকা আমার—”

মহারানী প্রবোধ দিয়ে বললেন, “তা কি আমি বুঝি না। কিন্তু শুভঙ্কর অলকা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমার সাধনা। অলকার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে শুভঙ্করকে বশে রাখা যাবে না। শুভঙ্করকে হাতে রাখতে না পারলে আমার মস্ত হার। আমার সাধনায় ব্যাঘাত তো ঘটবেই, ইহলোকে পরলোকে যেখানেই থাক মুস্তাফা টিটকিরি দেবে।”

জাহানারা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, “এ যেন হাটে নামার মতো। দ্বিতীয় দিন যখন ছুটে বার হয়ে গেল নিজের কাছেই যেন আমার মাথা হেঁট হল।”

মহারানী বললেন, “অতশত তোর ভাববার দরকার কী? কী কাজে কেন তোকে লাগিয়েছি জানিস। উদ্দেশ্য হীন হলে আমি কি

ছাই তোকে বলতে যেতাম ?”

জাহানারা বলল, “তুমি বাঘিনীকে দিয়ে শেয়ালের কাজ করিয়ে নিতে চাও ?”

মহারানী বললেন, “বাঘিনী বাঘিনীই আছে। থাকবে। আমাদের দুজনের অদৃষ্ট হচ্ছে শেয়াল। তাকে খেলতে দিতেই হবে।”

জাহানারা বলল, “বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়িতে আসবে না। অফিসেও যেতে দেবে না। তা ছাড়া অফিসে কোনো দিক দিয়েই এক পাও এগোনো চলবে না। আমার তো লোক জানাজানির ভয়ে বাড়ির বাইরে মুখ দেখানো বন্ধ। অফিসে এক হাট লোকের ভিতর রেশমী জালিতে মুখ ঢেকে যাওয়া মানে সকলের চোখ নিজের ওপর টেনে আনা।”

মহারানী বললেন, “তা হলে অতিথিমহলেই যে ভাবে হোক ব্যবস্থা কর। রাতে এক ফাঁকে এসে দেখা করে যাবি। সম্ভব হলে কালই—”

জাহানারা ক্লান্ত স্বরে বলল, “হ্যাঁ। কালই আমিও ব্যাপারটা চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।”

মহারানী তমিস্রা চৌধুরী মস্তিষ্ক দিয়ে চেয়েছিলেন ঈশ্বরকে, হৃদয় দিয়ে একটি মানুষকে। প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের ভিতর একটা আড়াআড়ি চলে আসছিল। তিনি ছিলেন ঝড়ের হাওয়ায় সলতের আগুনের মতো। একমুহূর্তে উঁচুতে শিখা তুলে ঈশ্বরকে ছুঁয়ে পরমুহূর্তে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় নুয়ে পড়তেন একটি বিশেষ মানুষের মন স্পর্শ করার জন্য। এই কঠোর সত্য তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইতেন না। নিজেকে বোঝাতেন শুধু একটি যে কোনো মানুষ নয়, বিশেষ মানুষ। তিনি তো আর কারো নন, ঈশ্বরের। এই মানুষটির ভিতর নিজেকে দেখতে গিয়ে ঈশ্বরের

ছায়াই দেখতেন। সাধনার কৃচ্ছ্রকে একটি অন্তরঙ্গ প্রয়োজনের গিঁঠে বাঁধবেন।

মুস্তাফাকে তিনি ভোলেননি। ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু মুস্তাফা তাঁর অর্থাৎ মহারানীর বর্তমান থেকে অতীতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রদীপে মুস্তাফার সলতে টিম টিম করে জ্বলছিল। জাহানারা কথা প্রসঙ্গে সেদিন মুস্তাফার নাম উল্লেখ করায় তিনি মুস্তাফা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আঁচ যেন গায়ে লাগল। মুস্তাফার অস্তিত্ব শুধু নয়, তাঁর নিকট উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-য়ে তাঁর সাধনায় মুস্তাফা অনুপরমাণু হয়ে প্রবেশ করলেন।

মুস্তাফাকে কেন তিনি ভুলতে পারেন না, তার কারণ পৃথিবীর কারো জানার কথা নয়। যাঁর জানার কথা তিনি জানেন। মুস্তাফার সঙ্গে তাঁর হঠাৎ ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা আর সকলের চোখে একটা রহস্য। তাঁর চোখে নয়। ছাড়াছাড়ির করুণ অধ্যায়টাকে তাঁর জীবনের পবম অহঙ্কারে আপ্লুত করে দেবার জন্য তাঁর ঈশ্বব সাধনা। দম্ভ দিয়ে দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ দেবার চেষ্টা।

মুস্তাফাকে একদিন মহারানী তমিস্রা বলেছিলেন, "মুস্তাফা! এই ক'বছর কাস্‌ল্‌-য়ে একমুহূর্তের জন্যও মুখোশ খুললে না। ঐ মুখোশের আড়ালে কী আছে জানতে ইচ্ছা করে।"

মুস্তাফা হেসে বলেছিলেন, "একটা মুখ। মানুষের। আর কারো নয়। সুন্দর, কুৎসিত সাধারণ কিম্বা বীভৎস। কিন্তু তোমার মুখোশ সম্বন্ধে আমাব কৌতূহল আরো বেশী।"

মহাবানী তমিস্রা স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমার মুখোশ?"

মুস্তাফা বলেছিলেন, "তোমার সাধনার মুখোশ।"

মহাবানী তমিস্রা সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "তোমার কথার অর্থ?"

মুস্তাফা বলেছিলেন, "ঈশ্বরপ্রেমের মুখোশে তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা

ঢাকবার চেষ্টায় তুমি একটি বিশেষ মানুষের প্রেমের একটা মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে নিজেকে ভোলাতে চেষ্টা করছ। তোমার এই সাধনার দুখণ্ড কখনো জোড়া লাগবে না। তুমি দুটো ভিন্ন সাধনার মাঝখানে পড়ে শূন্যে ঝুলবে। তোমার ভিতর খাঁটি জিনিস আছে। তুমি অনেক দূর যেতে পারো। কিন্তু তোমার একটি খুঁটির দরকার। বিপথে গেলে খুঁটির টানে যাতে ফিরে আসতে পারো। না হলে বিপথে এতদূরে চলে যাবে, একদিন ফিরে আসতে চাইলেও পারবে না।"

মহারানী তমিস্রা শ্লেষভরে বলেছিলেন, "তুমি বুঝি সেই খুঁটি ?"

মুস্তাফা জবাব দিয়েছিলেন, "সবপ্রকারে। বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, শক্তিতে, কৌশলে, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে।"

মহারানী তমিস্রা বলেছিলেন, "তোমায় খুঁটি আর কারো জন্য রাখো। আমার খুঁটি আমি নিজেই। আমার সাধনার দায়িত্ব আমার।"

মুস্তাফা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, "তোমার ভ্রান্তি ও আত্ম-বঞ্চনা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার চৌধুরী কাস্‌ল্‌-য়ে বাস ফুরোলো।"

মহারানী তমিস্রা দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন, "যদি যেতে চাও যাও। তোমার ইচ্ছায় বাধা দেব না।"

মুস্তাফা ও মহারানীর ভিতরের এই ব্যাপারটা বিন্দু বিসর্গ কেউ টের পায় নি। মুস্তাফা গোপনে প্রস্থান করলেন হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে। মাঝ রাতে না শেষ রাতে কখন কোন্ পথে বার হয়ে গেলেন কেউ জানল না। সকলে বুঝলো তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। তারপর অতিথিমহলের পালা সুরু হল। একে একে অতিথি এল গেল। অবশেষে শুভঙ্কর এল।

সমাজের চোখে মৃত ছদ্মবেশী বিদিশাকে মহারানী অতিথি মহলের পালায় একটা বিশেষ ভূমিকা দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য অনুমান করা

কঠিন নয়। অতিথি মহলে কোনো ক্রমেই যেন বাইরের পৃথিবীর চোখ না পড়ে। বিদিশাকে কাছে পাবার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিকে কাছে পাবার পথ খোলা থাকে। মৌনী তরুণীর মুখে রেশমী জাল। কণ্ঠে কথা নেই। ঐ ভূমিকা যে কোনো সময় স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যায়। যখন প্রয়োজন হল, শুভঙ্কর আসবার পর কয়েকটা দিনের জন্য বিদিশাকে ছুটি দিয়ে সরানো কঠিন হল না।

জাহানারার সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ হবার পরই মহারানী শুভঙ্করকে ও অলকা চৌধুরীকে টেলিফোন করেছিলেন। সারাদিন শুভঙ্করের চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলেন। স্নানাহার চিরকাল তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ততম পর্ব। তাও সেদিন তাঁর কাছে দীর্ঘ ঠেকল। শুভঙ্করের কথা ভাবতে ভাবতে আর একবার টেলিফোন তুলতে গিয়ে মহারানী নিরস্ত হলেন। যা বলার বলেছেন। সংক্ষেপে পরিষ্কার ভাষায়। নতুন আর কী বলা চলে!

বিগ্রহ পূজা সেরে মহারানী মহাপ্রভু-নামাঙ্কিত তাঁর অতিপ্রিয় গ্রন্থ খুলে বসলেন। তাঁর তত্ত্বের সমর্থন কি মহাপ্রভু করেন নি? মানুষের বেশে ঈশ্বর এ কথার অর্থ কী? কিন্তু তাঁর মনের সন্দেহ ঘোচে না। মহারানী জানেন তাঁর তত্ত্ব তাঁর একান্ত নিজের। এ তত্ত্ব কোনো ভুলের জন্যই, সে ভুল যত বড় হোক, ছাড়া চলে না। এ তত্ত্ব তিনি নিজে। তাঁর আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুর্বলতা ও অহঙ্কার। সঙ্গে সঙ্গে শুভঙ্করকে চোখের সম্মুখে দেখতে পান। তার ভিতর তিনি জাগছেন। প্রথমে ধীরে ধীরে। গতি বেড়ে শেষে প্রচণ্ড বেগে। মহারানী কল্পনা করেন শুভঙ্করও তার ভিতরের এই আশ্চর্য ঘটনা দেখছে, অনুভব করছে। সে বিস্ময়ে স্তব্ধ, নিশ্চল।

গ্রন্থ সামনে খুলে রেখে মহারানী একমনে চিন্তা করছিলেন। কত রাত হল খেয়াল ছিল না। দেয়াল ঘড়িতে এগারোটা বাজল। মহারানী দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রন্থ বুজিয়ে উঠতে যাচ্ছেন, এই সময় ঘরের নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে টেলিফোন বেজে উঠল। এত রাতে কার

টেলিফোন? মহারানী বিস্মিত হলেন। ইতস্তত করে রিসিভার তুলে কানে ধরলেন। সারাদিন সারা সন্ধ্যা মনের নানা ইশারায় বিপদের সঙ্কেত পেয়েছেন। কী অভ্রান্ত এই সঙ্কেত। মহারানীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ নেমে গেল। রিসিভারটা শক্ত মুঠিতে ধরলেন। এ কণ্ঠস্বর শুধু একজনেরই হতে পারে। তবু কানের ভুল অসম্ভব নয়। মহারানী নিজেকে আশ্বাস দেন।

মহারানী বললেন, "আমি তমিস্রা চৌধুরী। আপনার পরিচয়?" মহারানী রিসিভার কানে চেপে ধরলেন। যে গম্ভীর হাসি শুনলেন তা আর কার হতে পারে?

মুস্তাফা বললেন, "আমার পরিচয় সেদিনও দিতে পারি নি। আজই বা কী করে দিই? নামটা নিশ্চয়ই ভোলোনি?"

মহারানী রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "মুস্তাফা!"

মুস্তাফা বললেন, "অন্ততঃ তোমার কাছে।"

মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন, "নামটাও কী মুখোশ?"

মুস্তাফা হঠাৎ ভুল করতে যাচ্ছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "তা নয়। তবে মুস্তাফা নামে আমি সকলের চোখে আজও নিরুদ্দেশ। শুধু তোমার কাছে নয়!"

মহারানীর বুক দুলে দুলে উঠছিল। বললেন, "তুমি তা হলে বেঁচে আছো।"

মুস্তাফা বললেন, "ষোলো আনা। মরার ইচ্ছা কোনো কালেই ছিল না।"

মহারানী বললেন, "জানি। চিরকালই দেখেছি তোমার জীবন পিপাসা ছিল তীব্র।"

মুস্তাফা বললেন, "এখন তীব্রতম। ঐ পিপাসা শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখেনি, নিউ দিল্লীতে টেনে এনেছে।"

মহারানী বললেন, "টেলিফোন করেছ। লৌকিকতা না স্বার্থ?"

মুস্তাফা জবাব দিলেন, "বিশেষ ব্যক্তিগত স্বার্থ।"

মহারানী বললেন, "খুলে বলো।"

মুস্তাফা বললেন, "স্বার্থটা তোমার। তোমাকে একটা মস্ত ভুলের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। সেদিনও চেয়েছিলাম। আজও চাই।"

মহারানী বললেন, "ধন্যবাদ। তা হলে কথা এখানেই শেষ।"

মুস্তাফা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ?"

মহারানী বললেন, "কারণ আমার ভুল আমি আঁকড়ে থাকতে চাই।"

মুস্তাফা বললেন, "আমাকে খুঁটি করো না করো, ভুলের খুঁটিতে বাঁধা পোড়ো না।"

মহারানী বুঝলেন মুস্তাফা ঈশ্বর সাধনার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় ও অতিথিমহলের ব্যাপারও জানে। কিন্তু কী করে ?

মুস্তাফারও বুঝতে দেরী হয় না মহারানী কী বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। বলেন, "অতিথিমহলের ব্যাপার ও তোমার সাধনার নতুন উপসর্গ, ইতিহাস বলো কাহিনী বলো, আগাগোড়া জানি। তোমার নতুন শুঁয়োপোকাটিকে মুক্তি দাও।"

মহারানী বললেন, "তুমি তা হলে নিউ দিল্লীতেই ছিলে। আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করেছো।"

মুস্তাফা বললেন, "এখনও করছি। তোমার সর্বনাশা টানে। তুমি বাঁচতে চাও না অথচ আমি মানুষের চোখে মরে গিয়েও তোমাকে বাঁচাতে চাই।"

মহারানী বললেন, "মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে পাওয়া অসম্ভব নয়। সেদিন বলেছি, আজও বলছি।"

মুস্তাফা বললেন, "একটি মানুষের ভিতর ঈশ্বরের ইঙ্গিত অপরিমিত, কিন্তু প্রকাশ অকিঞ্চিৎকর।"

মহারানী তপ্ত স্বরে বললেন, "তুমি অবতার মানো।"

মুস্তাফা বললেন, "মানি। কিন্তু অবতারের ভিতরও ঈশ্বরের

একটা মুখই দেখি। সুস্পষ্ট। কিন্তু ভুলো না ঈশ্বর দশাননের আদি প্রপিতামহ। তাঁর অসংখ্য মুখ। তা ছাড়া অবতাররা সাধনার ল্যাবরেটরিতে শুঁয়োপোকা হতে আসেন না।" পরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "সারা মানুষ জাতির কিংবা জীবলোকের ভিতরও তাঁর প্রকাশ অসম্পূর্ণ। সারা সৃষ্টিতেও। খুঁজতে হয় একাগ্রমনে নিজের ভিতর, যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নাড়ির বন্ধন। সেই সঙ্গে সব মানুষের ভিতর, সকল প্রাণীর ভিতর, উদ্ভিদ ও বস্তুর ভিতর, সমস্ত সৃষ্টির ভিতর যদি তাঁর ইঙ্গিত ও প্রকাশের উপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারি, কল্যাণের সুরে জীবনের তার বাঁধতে পারি। আমিও অবশ্য মানুষেব উপরই জোর দেব, কারণ আমার চেতনা মানুষের চেতনা। সব মানুষের ভিতব যদি ঈশ্বরের প্রকাশ ও ইঙ্গিত বারবার অনুভব করতে পারি, মানুষ হিসেবে আমার ঈশ্বর সাধনায় সুফল ফলতে বাধ্য। কিন্তু একজনকে আঁকড়ে নয়।"

মহারানী তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, "তুমি এককে ভয় পাও বলে অনেকের আড়াল চাও। তোমার ঈশ্বর স্পষ্ট হয়ে উঠলে, তাকে দেখা সম্ভব হলে, তুমি ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে। সারা জীবন তুমি ঈশ্বরের টুকরো টুকবো উপাদান দিয়ে তত্ত্ব গড়বে। সেই তত্ত্বের পূজো করে শেষ হয়ে যাবে। তোমাব ক্ষমতার অভাব।"

মুস্তাফা জবাব দিলেন, "ক্ষমতার নয়, অহঙ্কারেব।"

মহারানী দৃঢ়স্বরে বললেন, "তুমি শুভঙ্করের কথা বলছ? কেন তোমার মাথা ব্যথা জানি না। সে এখন আমার সাধনার ল্যাবরেটরির শুঁয়োপোকা হতে পারে। কিন্তু প্রজাপতি হয়ে যেদিন আকাশে পাখা মেলবে তোমাব মাথা হেঁট হবে।" তারপর ভিন্ন সুরে বললেন, "যদি পারো একদিন দেখা কোরো। কথা হবে।"

মুস্তাফা হেসে বললেন, "দেখা হবে। শুভঙ্করের মুক্তি এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। তার জন্যই তোমার সঙ্গে অচিরেই দেখা হবে। রানীমহলের জাফরীর আড়ালে থেকেও আমাকে এড়াতে পারবে না।

মহারানী রিসিভারটা রেখে কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে ক্লান্ত শরীরে শয্যা নিলেন। রাতের খাবার পাশে ডাইনিং রুমে টেবিলে সাজানো ছিল। আহারের রুচি চলে গেল। উঠতে ইচ্ছা হল না। নিদ্রা ও তন্দ্রার মাঝখানে তিনি নিজেকে একটা অদ্ভুত জগতে দেখলেন। এ জগতে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই অর্ধস্ফুট আলোয় অস্পষ্ট। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের আলো নিঃশেষ হয়ে এসেছে। মানুষ পশু পক্ষী হঠাৎ চলচ্ছক্তি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে ভাষা। অর্থপূর্ণ কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা কারো নেই। একটা কাতর গোঙানী চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। সকলেই সকলের দিকে ভয়ে অবিশ্বাসে তাকাচ্ছে। হঠাৎ নিকটে দূরে চারিদিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল। সকলে একই সময়ে একদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালো। মহারানী দেখলেন তাঁর পাশে শুভঙ্কর। তাদের সকলের লক্ষ্য তাঁরা দুজন। কারণ বুঝতে দেরী হল না। তাঁদের উপর আকাশের একটা অংশ ফেটে গিয়ে এক অদ্ভুত পিঙ্গল আলো এসে পড়েছে। তিনি ও শুভঙ্কর ক্রমে পাথর হয়ে যাচ্ছেন। কে যেন তাঁর কানে কানে বলল, "এখনো সময় আছে। রক্ষা পেতে চাও তো শুভঙ্করকে ছাড়ো।" মহারানী শুভঙ্করকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। চেঁচাতে চেষ্টা করলেন। একেবারেই পাথর হয়ে গেলেন।

মহারানীর ঘুম ভেঙে গেল। বেড সুইচ টিপে বিছানার পাশের আলোটা জ্বাললেন। ঘড়িতে রাত একটা। প্রায় দেড় ঘণ্টা বিছানায় কেটেছে। কতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। মহারানী বিছানায় উঠে বসলেন। ফাঁকা ঘর আজ আরো ফাঁকা ঠেকল। ঘরের বাইরে ঢাকা বারান্দা। তারপর রেলিং ঘেরা খানিকটা ছাত। শ্বেতপাথরে বাঁধানো। সেখানে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। ঐ অন্ধকারও যেন তাঁর ঘরের আলো বা অন্ধকারের মতো অতো শূন্য নয়।

মহারানী ছাতে এলেন। আকৈশোর রিক্ত মন বহন করে

এসেছেন। কিন্তু কোনো দিন নিজেকে এত দীনা মনে হয় নি। তাঁর ঈশ্বর সাধনায় আজ এ কী পরীক্ষা! মহারানী অতিথিমহলের কথা ভাবেন। সবিস্ময়ে দেখেন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে অতিথিমহল তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ মহলটা ফেটে যায়। ভিতরটা দেখা যায়। নরম আলো। সুখশয্যা। সেখানে সুখনিদ্রায় অচেতন তাঁর ঈশ্বর সাধনার ঈপ্সিত সহচর শুভঙ্কর। মহারানীর সঙ্কট তাকে স্পর্শ করে না। সে যেন তাঁর এলাকার বাইরে। দুঃস্বপ্নের শুভঙ্কর, তাঁর সাধনার ভাবী সহচর শুভঙ্কর ও এ শুভঙ্কর এক নয়। যে শুভঙ্করকে তিনি তাঁর সাধনায় পেতে চান, সে কি তবে আগাগোড়া তাঁর কল্পনা? সে কি কখনোই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তার নির্মোক ভেদ করে তাঁর ঈপ্সিত রূপে দেখা দিতে পারবে না?

মহারানীর যখন ঘুম ভাঙল, রোদ উঠে গিয়েছে। চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল। মহারানী মনে ভয় ও সন্দেহ নিয়ে বিছানা থেকে নেমে রিসিভার তুললেন।

জাহানারা বলল, "মুস্তাফা এখন নিউ দিল্লীতে। শুনেছি শুভঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।"

মহারানী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। মুস্তাফা নিজের আগমন বার্তা ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছে, অসম্ভব কথা। জিজ্ঞাসা করলেন, "এ খবর দিল কে?"

জাহানারা জবাব দিল, "আমেদ। কাল পুরোনো দিল্লীতে রাতে হঠাৎ মুস্তাফা তার সম্মুখে পড়ে যায়।"

জাহানারার পেয়িং গেস্ট আমেদকে মহারানী কখনো স্বচক্ষে দেখেন নি। জাহানারার মুখে তার বিষয় অল্প বিস্তর শুনেছেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর অতিথি সংগ্রহের ব্যাপারে জাহানারার মারফৎ সে উপযাচক হয়ে সাহায্য করেছে। আজ হঠাৎ আমেদ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল হয়। মহারানী একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন—মুস্তাফার সঙ্গে আমেদের সম্পর্ক কী?

মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কী শুনেছিস ?"

জাহানারা বলল, "আমাদের ধারণা মুস্তাফা শুভঙ্করকে অতিথি মহল থেকে সরাতে চেষ্টা করছে।"

এ কথাও আমেদ জানে ? মহারানী বিচলিত হন। জিজ্ঞাসা করেন, "সব খবর আমেদকে দেয় কে ?"

জাহানারা বলে, "হয়তো মুস্তাফা নিজেই। শুনেছি এখন আমেদের টাকায়ই মুস্তাফার চলে। তবে আমাদের সঙ্গে অতিথি মহলের ব্যাপারে আমেদের যে একটা সম্পর্ক আছে মুস্তাফা জানে না।"

মহারানী বললেন, "কী করে বুঝলি ?"

জাহানারা বলে, "আমেদ বলছিল।" পরে বলল, "আমেদ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে।"

মহারানী কৌতূহলী হন। ঈষৎ বিরক্তও। তবু জিজ্ঞাসা করেন, "কী কথা ?"

জাহানারা বলল, "আমেদ বলছে কোনো কারণে মুস্তাফা তাকে সমীহ করে চলে। তোমার অনুমতি পেলে সে মুস্তাফাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলবে। তুমি যা চাও মুস্তাফাকে দিয়েই করিয়ে নেবে। বলছে দরকার হলে মুস্তাফা নিজেই শুভঙ্করকে নিয়ে এসে তোমার পায়ে ফেলবে। এ জন্যে শুভঙ্করের চৌধুরী কাস্‌ল্ ছাড়া হবে না।"

মহারানী বললেন, "কী প্রলাপ বকছিস ! তোর ও আমেদের, দুজনেরই মাথা খারাপ।"

জাহানারা বলল, "আমেদের একটা সর্ত আছে। তাকে কাল দিনে রাতে খুশি মতো কাস্‌ল্-যে আসা যাওয়া করতে দিতে হবে। খেয়ালী লোক। পথ আটকালে কিংবা কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে বিগড়ে যাবে।

মহারানী বললেন, "কাল ? আমাদের অতিথিমহলের ব্যাপারটা—"

জাহানারা বলল, "আমেদের কথার পর অতিথিমহলের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। আমেদ যখন কথা দিচ্ছে, শুভঙ্কর তোমার পায়ে মাথা মুড়োলো বলে।"

মহারানী বললেন, "আমেদের নামে একটা অনুমতিপত্র লিখে রাখছি। এক সময়ে এসে নিয়ে যাবি।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মহারানী ভাবতে শুরু করেন। মুস্তাফার উপর টেক্কা দিতে চায় কে এই আমেদ?

যাঁরা মানুষের জীবনের গভীর দিকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের কারো কারো মতে আমাদের জীবন অসংখ্য তরঙ্গের একটা সমষ্টি। এর ভিতর কয়েকটা তরঙ্গ প্রচণ্ড বেগে ওঠে পড়ে। মানুষের অলক্ষিত মন এদের খেলাঘর। এইরকম এক একটা তরঙ্গ কয়েকটা মনকে দুরন্ত ঘটনায় টেনে নেয়। ভেঙে ভেঙে যতক্ষণ না এই তরঙ্গ নিশ্চিহ্ন হয়, একটার পর একটা অনুরূপ ঘটনা ঘটতে থাকে।

পুরোনো কেল্লার ঘটনা শেষ হতে না হতে নিউ দিল্লীর স্বাধীনতা তোরণের বিশাল প্রান্তরে আমেদ ও মুস্তাফা যে একটা অনুরূপ ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়ল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যে ঢেউ শুভঙ্কর ও অলকা চৌধুরীকে একটা বিশেষ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পুরোনো কেল্লায় নিয়ে গিয়েছিল, তারই একটা ভাঙন মুস্তাফা ও আমেদকে স্বাধীনতা তোরণের প্রান্তরে এনেছিল।

মুস্তাফা ও আমেদ নিউ দিল্লীর প্রান্তে পুরোনো দিল্লীর একটা নির্জন পল্লী থেকে একই সময়ে স্বাধীনতা তোরণে এলেন। অন্য যে কোনো দুটি মানুষ হলে বলত, "কী আশ্চর্য! একই সময়ে পায়ে পা মিলিয়ে এলাম!" কিন্তু মুস্তাফা ও আমেদের জীবনে এই ছিল নিয়ম। তাঁরা দুজনে বিশেষ অর্থে ছিলেন অভিন্ন আত্মা।

মুস্তাফা বললেন, "আমেদ! আমি সম্পূর্ণ তোমার হাতে।"

আমেদ বলল, "এ ভাবে নিজের বোঝা পরের ঘাড়ে চাপাতে

পারলে কারো হাতে যেতে কারো বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।”

মুস্তাফা বললেন, “তুমি শুধু বোঝাই দেখছ আমেদ। ঐ বোঝার সঙ্গে আমি কি তোমাকে আর কিছু দিই নি?”

আমেদ জবাবে বলল, “দিয়েছ। একই মুহূর্তে একই সময়ে একই নাটকে দুটি ভিন্ন ভূমিকায় নামার সুযোগ দিয়েছ। আমাকে ছলনার অবতার কৃষ্ণ বানিয়ে ছেড়েছো।”

মুস্তাফা বললেন, “চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর ব্যাপারে এই যুগ্ম ভূমিকা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তুমি শুভঙ্করের কৃষ্ণসারথী, আমার শিখণ্ডী। দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র শেষ হয় নি। সেটা দৃষ্টিভ্রম। মানুষের মনে ঢুকে গিয়ে কুরুক্ষেত্র কখনো বড় কখনো ছোট মঞ্চে চোখের আড়ালে মহলা দিয়ে চলেছে। তোমার এ ভূমিকায় না নেমে উপায় ছিল না আমেদ।”

আমেদ বলল, “তুমি কী চাও?”

মুস্তাফা বললেন, “আমি? আমি তোমার হাতে। তুমিই বরং বলো তুমি কী চাও?”

আমেদ বলল, “মুস্তাফা! তোমার মুখে আবরণ। পৃথিবী তোমাকে সহজ মনে গ্রহণ করবে না। ফলে তুমি আমার শরণ নিতে বাধ্য হয়েছ। ছদ্মবেশের অসুবিধে যেমন আমার নেই, তেমনি সুবিধেও নেই। আত্মগোপনের পথ নেই। সেদিক দিয়ে আমার সমস্যা তোমার সমস্যার চেয়ে ঢের কঠিন।”

মুস্তাফা বললেন, “জানি। তবু বলো। বুঝতে দাও।”

আমেদ বলল, “মুস্তাফা! আমি কী চাই খুলে বলার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই। আমার সন্দেহ তুমি মহারানীর সঙ্গে তোমার অতীতের সম্পর্ক ভুলতে পারো নি।”

মুস্তাফা বললেন, “ভুলে যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে আমার কর্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি জানো আমি তাত্ত্বিক। আমার কাছে

সত্যের চেয়ে বড় কেউ বা কিছু নেই।"

আমেদ বলল, "তা হলে মহারানীকে পথের ধূলোয় টেনে আনতে তোমার আপত্তি নেই।"

মুস্তাফা বললেন, "তার প্রয়োজন কী?"

আমেদ বলল, "মহারানীর শ্রেণীর মানুষরা মরেও মরে না। একেবারে শেষ না হয়ে গেলে হঠাৎ নতুন করে শুরু হয়। এরা কখন কোন্ কৌশলে কার রথের চাকা মাটিতে বসিয়ে দেয় কে জানে!"

মুস্তাফা ধীরে ধীরে বললেন, "আমেদ! এঁদের পুরোপুরি বুঝবার আগে এরা শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটা অভাব থেকে যায়।"

আমেদ বললেন, "আশ্চর্য! এখনো তোমার জানার আগ্রহ গেল না?"

মুস্তাফা কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "কী করে যাবে! আমি যে জাতের মানুষ আমাদের জীবন পিপাসা মৃত্যুর মুহূর্তেও যায় না।"

আমেদ বলল, "তোমার কথা শুনে আমার একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্মৃতি মনে জাগছে। তুমি ক্রুশে চাপানো যীশুর ছবি দেখছ? ঐ ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে, ঐ মৃত্যুযন্ত্রণাসত্ত্বেও যীশুর আদৌ মরার ইচ্ছা ছিল না। ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব হলে যীশু আরো কিছুকাল জীবনের ভাঁড়ার থেকে আরো কয়েকটা উত্তর সংগ্রহ করতেন। জীবন পিপাসা মেটাতেন। যীশু যে জল জল বলে চেঁচিয়েছিলেন, কোন্ জলের জন্য?"

মুস্তাফা বললেন, "আমেদ! মহারানীকে শেষ করে দেওয়া তোমার আমার কর্ম নয়।"

আমেদ বলল, "তুমি তাই ভাবো?"

মুস্তাফা বললেন, "প্রমাণ পাবে।"

আমেদ বলল, "অন্তত তাঁর সাধনার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারি।"

মুস্তাফা হাসলেন। বললেন, "চেষ্টা করে দেখো। শেষে জাহানারার সঙ্গে জোট বেঁধে মহারানীর হয়ে আমার বিরুদ্ধেই চক্রান্ত না করে বসো।"

আমেদ হো হো করে হেসে উঠল। পরে বলল, "তুমি মহারানীর সাধনা পণ্ড করতে চাও?"

মুস্তাফা বললেন, "না। তাঁর সাধনার গলদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই।"

আমেদ বলল, "শুভঙ্করকে কেড়ে নিয়ে?"

মুস্তাফা বললেন, "শুভঙ্করের সম্মুখে দুদিকে পথ খোলা রেখে।"

আমেদ বলল, "যদি শুভঙ্কর নিজেই একটা পথ বন্ধ করে দেয়?"

মুস্তাফা বললেন, "তুমি আছো কিসের জন্য আমেদ? অন্ততঃ অলকা চৌধুরীর হস্টেলের পথ যেন খোলা থাকে।"

আমেদকে চিন্তিত মনে হল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, "ঐ শুঁয়োপোকা যার হাতেই হোক, প্রজাপতি হবেই। আমার মনে হয় রূপান্তর শুরু হয়েছে। যদি প্রজাপতি হয়ে অতিথি মহলের একটা ফাঁক দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যায়?"

মুস্তাফা বললেন, "বেরিয়ে গিয়ে আবার উড়ে আসতে পারে।"

আমেদ কঠোর স্বরে বলল, "যে করেই হোক, সে পথও বন্ধ করতেই হবে।"

মুস্তাফা হেসে বললেন, "আমার ক্ষমতায় তোমার ক্ষমতা। কারো পথই কেউ চিরকালের জন্য বন্ধ করতে পারে না।"

আমেদ বলল, "যেমন তুমি নিউ দিল্লীতে ফিরে এসে ক্ষান্ত হও নি। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-এর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছ।"

মুস্তাফা বললেন, "গূঢ় কারণ আছে।"

আমেদ বলল, "জানি।"

মুস্তাফা বললেন, "কারণ আছে জানো। কিন্তু কারণটা জানো না।"

আমেদ হেসে বলল, “তুমি জানো ?”

মুস্তাফা বললেন, “এত গূঢ়, সন্দেহ হয় জানি না।”

আমেদ বলল, “মুস্তাফা ! তুমি মুক্তপুরুষ। মহাতাত্ত্বিক। তবু আমার জানতে ইচ্ছে হয়, তুমি কোনোকালে মহারানীকে চেয়েছিলে কি না !”

মুস্তাফা বললেন, “তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন মহারানীকে চাই কি না।”

আমেদ জিজ্ঞাসা করল, “চাও ?”

মুস্তাফা বললেন, “চাওয়ার অর্থটা সম্পূর্ণ বোধগম্য না হওয়া পর্যন্ত কোনো উত্তর দিতে পারি না।”

আমেদ বলল, “উত্তর দিও না। তোমার উত্তর আমার কাজে বাধাসৃষ্টি করতে পারে।”

মুস্তাফা বললেন, “ভেবে দেখেছো আমেদ, তুমি জাহানারা মারফৎ দীর্ঘকাল মহারানীর মিত্র হওয়া সত্ত্বেও শত্রু। আমি দীর্ঘকাল শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আজ প্রায় শত্রুতা ভুলতে বসেছি।”

আমেদ দৃঢ়স্বরে বলল, “তুমি আমার হাতে। নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করো। আত্মকলহে আমাদের ষড়যন্ত্র না ফেঁসে যায় !”

অফিসে শুভঙ্কর আমেদের টেলিফোন পেল। আমেদ বলল, “মুস্তাফার আবির্ভাবের ফলে অতিথি মহলের ব্যাপারে আজকালের ভিতর একটা হেস্তনেস্ত হবার সম্ভাবনা। আজ এবং কাল তুমি ও অলকা চৌধুরী সন্ধ্যা থেকে সকাল যে যার ঘরবন্দী থাকবে। যে কোনো সময়ে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার হতে পারে। তোমার সারথী হয়ে রথ চালাবার সময় এসে গিয়েছে।”

শুভঙ্কর কোনো কথা বলার আগেই আমেদ লাইন ছেড়ে দিল।

ঠিক তার পরই টেলিফোন বাজল রোশেনারা মঞ্জিলে।

আমেদ বলল, “জাহানারা ! সব ঠিক তো ?”

জাহানারা বলল, "বিলকুল। কিন্তু মহারানীর কথা সারাক্ষণ ভাবছি। দেখো, মহারানীর কোনো—"

জাহানারা কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। আমেদ বলল, "মহারানীর বিষয় ভাববার যে লোকটির সবচেয়ে বড় অধিকার, তার হাতে সব চিন্তাভাবনা ছেড়ে দাও।"

জাহানারা বলল, "ছেড়ে দিতে চাইলেই দেওয়া যায় না। তুমি কী উদ্দেশ্যে কী চাল চালছ, ভেবে কূলকিনারা পাই না। তুমি কোন্ দলে অথবা দু'দলেই কিনা, কতটা কোন্ দলে ভাবতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে যায়।"

আমেদ বলল, "পর্দা ওঠার দেরী নেই। এখন নাটকে কলম চালানোর প্রশ্ন ওঠে না। কথামতো কাজ করো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো।"

চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে বিক্রম শা কিছুকাল তাঁর পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিলেন। বড় হিসেবের চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নিজেকে বেশ খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি এস্টেটের রুটিন বাঁধা কাজ করে যাচ্ছিলেন। জীবন ক্রমশই একটা বোঝা হয়ে পড়ছিল।

মহারানী স্বয়ং বিক্রম শা-কে আমেদের কথা বলতে বিক্রম শা যেন একটা খোঁচা খেয়ে জেগে উঠলেন। কাস্‌ল্‌য়ে কেন আমেদ নামের একটি অপরিচিত ব্যক্তির আগামীকাল অবাধ যাতায়াত সম্বন্ধে হুকুম দেওয়া হচ্ছে ভেবে তিনি একটু আহত এবং তার চেয়ে ঢের বেশী কৌতূহলী হলেন। তিনি ক'বছর ধরে কাস্‌ল্‌-এর ম্যানেজার। তাঁরও কাস্‌ল্‌-এর সর্বত্র যাওয়ার হুকুম নেই। অতিথি মহল তো নিষিদ্ধ এলাকা। রানীমহলেও ডাক না পেলে নিজে থেকে যাওয়া যায় না।

বিক্রম শা চতুর লোক। আমেদের সম্বন্ধে মহারানীর নির্দেশ

যে কোনো বিশেষ ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস বুঝতে তাঁর দেরী হয় না। গত ক'দিনের ভিতর অতিথি মহলের তরুণীকেও ঘন ঘন কাস্‌ল্‌-য়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। কিছুকাল সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। শরীরিনী তরুণীর পুনরাবির্ভাবও মামুলী প্রত্যাবর্তন নয়। কোনো নতুন ঘটনার ইঙ্গিত। দুয়ে দুয়ে চারের হিসেব বিক্রম শা বোঝেন।

বিক্রম শা মহারানীকে তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে চিরকাল দূরে রেখে আসছিলেন। মহারানীর সাধনা বা তাঁর রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো শুধু অনাবশ্যক নয় অনধিকারচর্চা মনে করতেন। কয়েকটা দিন আগে তাঁর আকস্মিক বৈরাগ্যের মুহূর্তে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠি মহারানীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত যোগাযোগ। কিন্তু আমেদ সম্বন্ধে মহারানীর হুকুম পাবার পর থেকে তিনি মহারানী সম্বন্ধেও ভাবতে শুরু করলেন। চৌধুরী কাস্‌ল্‌ সম্বন্ধে তো বটেই।

তাঁর নতুন চিন্তাটা সারাদিন তাঁকে একটা অস্বস্তিকব কৌতূহলের ভিতর রাখল। বিক্রম শা কাজে মন দিতে পারলেন না। বারবার ঐ এক চিন্তায় ফিরে এলেন। সন্ধ্যা হতেই সামান্য কিছু খেয়ে একখানা বই খুলে বসলেন। বইয়ের ছত্রগুলো এলোমেলো হয়ে তাঁর চোখের সঙ্গে অমার্জনীয় রসিকতা শুরু করল। বিক্রম শা বই মুড়ে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কয়েকবার তন্দ্রা এল, ঘুম এল না। শেষে দু'চোখ বুজে তিনি ঘুমের কল্পনা কবতে লাগলেন।

তন্দ্রা বা নিদ্রা কোন্‌ অবস্থায় ছিলেন বলা কঠিন। খুট করে একটা আওয়াজ হতে বিক্রম শা-র দুচোখ সম্পূর্ণ খুলে গেল। হালকা চলাব শব্দ, শাড়ির খসখস আওয়াজ, নারীদেহের সৌরভ তাঁর শিয়রের ধারে জানালায় নিশীথের এক বিচিত্র আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। বিক্রম শা বিস্মিত হলেন। তাঁর জানালার পাশে? ঠিক তখন কাস্‌ল্‌-এর সদরে একটার ঘণ্টা বাজল। বিক্রম শা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। রাত একটায় তাঁর জানালার ধারে এ কার আবির্ভাব?

মহারানীর? বিশেষ করে তাঁর জানালার ধারে কেন? তাঁকে দিয়ে মহারানীর কী প্রয়োজন? না চৌধুরী কাস্‌ল্‌য়ে তাঁর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে তিলে তিলে কোনো বিপদের সৃষ্টি হয়েছে? তার ফলে শুভঙ্কর কি বিপন্ন? এ বিপদ কার সৃষ্টি? মহারানীর? আজ রাতে মহারানীর একি অভিসার না অভিযান? কিন্তু, তাহলে মহারানী তাঁকে কেন ইঙ্গিতে হাতছানি দিতে আসবেন? যদি নিশীথচারিনী মহারানী না হয়ে আর কেউ হয়? কে সে? যে-ই হোক যদি সে বিপদ নিয়ে আসে এবং সে বিপদের লক্ষ্যস্থল শুভঙ্কর না হয়ে মহারানী হন, তাহলে?

বিক্রম শা-র মস্তিষ্ক একটার পর একটা সম্ভাবনার ফলাফল কয়েক মুহূর্তে বুঝবার চেষ্টা করল। বিক্রম শা বুঝলেন এখন ঘরে বসে মাথা খাটানোর চেয়ে বিপদকে অনুসরণ করে তার প্রকৃত রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা ভালো। যদি কোনো অঘটনের আশঙ্কা থাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে যতটা সম্ভব পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়াও কাস্‌ল্‌-এর ম্যানেজার হিসেবে তাঁর একটা গুরুদায়িত্ব আছে। মহারানীর হুকুম, শুভঙ্করের অভিরুচি, কোনো অজুহাতেই এ দায়িত্ব এড়ানো চলে না। বিক্রম শা ড্রয়ার থেকে তার রিভলবার বার করে পকেটে পুরে নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বার হয়ে এলেন।

নিস্তব্ধ রাত। বাতাস পড়ে গিয়েছে। কোথাও কোনো কপাট খোলা নেই। এত রাতে কাস্‌ল্‌-য়ে কারো আবির্ভাব শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব। কাস্‌ল্‌-য়ের বাঁধা আইন ভেঙে সদরমহলের গার্ড কাউকে ঢুকতে দেবে, ভাবা যায় না। একটা কিন্তু অবশ্য থেকে যায়। মহারানীর গোপন আদেশ। যদি এ রকম কোনো আদেশ থাকে, তাঁর জানা নেই। তিনি বিরুদ্ধাচারণের দায়মুক্ত। না থাকলে অবিলম্বে বিষয়টার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

যে দেহসৌরভ ঘরে বিছানায় শুয়ে ঘ্রাণে অনুভব করেছিলেন,

ঘরের বাইরে প্রশস্ত অলিন্দে পুনরায় ঘ্রাণে তা টের পেলেন। প্রথম শীতের ঠাণ্ডায় যেন জমে রয়েছে। সৌরভের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ থাকে না। একটা পাথরের দেয়ালের মতো সত্য ও বাস্তব। বিক্রম শা একবার মহারানীর মহলের দিকে, আর একবার অতিথি মহলের দিকে গেলেন। অতিথি মহলে যে পথ গিয়েছে সেখানে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম ঘ্রাণে যে গন্ধ পেলেন তা কাস্‌ল্‌-এর চির পরিচিত বস্তু। এ গন্ধ কাস্‌ল্‌-এর চরিত্রের স্বাদের মতো। বিক্রম শা ফিরে এসে মহারানীমহলের পথ ধরে চললেন। সূক্ষ্ম শরীরীগন্ধ তাঁকে সম্মুখে টেনে নিয়ে চলল।

রাতের তৃতীয় প্রহরে মহারানী মহল যেন কোনো অজ্ঞাত কৌশলে পৃথিবী গ্রহ থেকে, ইহলোক থেকে সরে এসেছে। এখানে যেন অপরিচিত একটা পৃথিবী পরিচিত পৃথিবীর খোল ভেঙে বার হয়েছে। পৃথিবীতে দিন রাতের, উষা ও গোধূলির ভেদ আছে। সৃষ্টির নিয়মে একের পর এক আসে। ঘণ্টা প্রহরের একটা হিসেব মেনে চলতে হয়। উষা ও গোধূলিকে এক সঙ্গে শুধু কল্পনায় পাওয়া চলে, একই সময়ে তাদের দুজনের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া চলে না। কিন্তু এখানে সৃষ্টির নিয়ম লোভী মনের কল্পনার কাছে হার মেনেছে। মহারানী মহলে যাবার অলিন্দপথ যেন নতুন সৃষ্টির আদি ও অন্ত। কোথাও উষার নরম আলো, গোধূলির সোনালী-গেরুয়া আভাস, মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি, শুক্ল রাতের স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত। রামধনুর যতগুলি রঙ তাদের নানা মাত্রায় নানা উপায়ে মিশিয়ে আলো অন্ধকারের অসংখ্য বিচিত্র রঙ। এ যেন আলো অন্ধকারের ও রঙের মনগড়া পৃথিবী। এখানে এধারে ওধারে অসংখ্য ছায়া। সেই সব ছায়ারও কত রঙ!

নিউ দিল্লীর এক প্রান্তে চৌধুরী কাস্‌ল্‌। তার রানীমহলে গভীর রাত্রে এসে বিক্রম শার মনে হল তিনি একটা অনাবিষ্কৃত আলো ও ছায়ার জগতে কোনো অলক্ষিত পথে ঢুকে পড়েছেন। শুধু তিনি

নন, তাঁর জানালার পাশের সেই গন্ধ! বিক্রম শা গন্ধ অনুসরণ করে এগোতে থাকেন। পুরু নরম গালিচায় নিস্তব্ধ রাতেও তাঁর পায়ের কোনো আওয়াজই তিনি পান না। যেতে যেতে এক সময়ে তাঁর মনে হয় তিনি কি গন্ধের পিছন নিয়েছেন না গন্ধ তাঁকে কোনো গুপ্ত অভিপ্রায়ে কৌশলে টেনে নিয়ে চলেছে! বিপদের মুখে? না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে?

মহারানী মহলে পৌছনোর কিছু আগে অলিন্দ পথ হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে দরবার ঘরের পাশে শেষ হয়ে আর একটা সংকীর্ণ পথ শুরু হয়েছে। সেখানে সাদা ঝাড়ের চড়া আলোয় সব রহস্যের অবসান। পাশেই দরবার ঘরের জাফরী। একটা ছায়া অলিন্দ পথের দেয়ালের পাশ দিয়ে জাফরীর আড়ালে সরে যায়। বিক্রম শা নতুন পৃথিবীর একটা ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে তাঁর পুরনো জগতে পড়েন। তড়িৎ গতিতে জাফরীর আড়ালে গিয়ে রিভলবার তুলে ধরেন।

বিক্রম শা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কে?"

নিশীথ-চারিনীর মুখে রেশমী জালি। সে আঙ্গুল দিয়ে রেশমী জালি দেখায়।

বিক্রম শা নিশীথ-চারিনীর আপাদমস্তক দেখে মনস্থির করে ফেলেন। চাপা গলায় বলেন, "আপনি যদি মহারানী হন, আমার কৌতূহল মার্জনা করবেন। কিন্তু কাস্‌ল্‌-য়ে সকলের, বিশেষ করে মহারানীর, নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আমার জানা দরকার আপনি কে। আপনি যদি মহারানী না হন, আমার কর্তব্য আপনাকে বাধা দেওয়া।"

বিক্রম শা রেশমী জালি সরাতে নির্দেশ দেন। নিশীথচারিনী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। বিক্রম শা এবার রিভলভার তার ললাট লক্ষ্য করে দৃঢ় হাতে ধরেন। কিন্তু নিশীথচারিনী নিশ্চল নির্বাক। বিক্রম শা পিছনে গিয়ে তার পিঠে রিভলভার ছুঁইয়ে বলেন, "চলুন।" নিশীথচারিনী তাঁর নির্দেশ মতো চলতে থাকেন।

বিক্রম শা বিস্মিত হন।

যে পথে বিক্রম শা মহারানী মহলের প্রান্তে গিয়েছিলেন সেই পথেই ফিরে এলেন। সঙ্গে রাতের অজ্ঞাত অতিথি। মহারানী?

ঘরে ঢুকে বিক্রম শা একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসুন।"

নিশীথচারিনী বসলেন।

বিক্রম শা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?" কোনো উত্তর নেই।

বিক্রম শা জিজ্ঞাসা করলেন. "আপনার উদ্দেশ্য কী?"

এবারও কোনো উত্তর পেলেন না।

বিক্রম শা বললেন, "আপনি কার হুকুমে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বলুন। আমি আপনার জবাবে সন্তুষ্ট হলে এখনই আপনি ছাড়া পাবেন। না হলে—"

এতক্ষণে নিশীথচারিনীর মুখে কথা ফুটল। বললেন, "না হলে— না হলে কী?"

মহারানীর কণ্ঠস্বর নয়। তবু, তবু কোথাও যেন একটা মিল আছে। ধ্বনির নয়, ব্যঞ্জনার। বিক্রম শা-র বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু সংকল্প দৃঢ়তর হয়। আজ রাতে তিনি নৌকো পুড়িয়ে রহস্যের জবাবের খোঁজে নতুন ডাঙায় পা দিয়েছেন। পরিণামের চিন্তা প্রয়োজনের তলায় চাপা পড়ে যায়।

বিক্রম শা কঠোর স্বরে বললেন, "ছাড়া নাও পেতে পারেন।"

নিশীথচারিনী বললেন, "ধরে রাখবেন?"

বিক্রম শা বললেন, "হ্যাঁ।"

নিশীথচারিনী বললেন, "পারবেন না।"

বিক্রম শা হাসলেন।

নিশীথচারিনী বিক্রম শা-র হাসি গ্রাহ্যের ভিতর না এনে বললেন, "কজন মেয়ে আজ পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছেন? একজনকেও?"

বিক্রম শা-র আপাদ মস্তক কেঁপে উঠল। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা

করলেন, "আপনি কে ?"

নিশীথচারিনী বললেন, "যাদের ধরে রাখা যায় না তাদের একজন।"

বিক্রম শা বললেন, "যদি পারি।"

নিশীথচারিনী বললেন, "আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি। চেষ্টা করুন।"

বিক্রম শা হঠাৎ রেশমী জালি সরিয়ে দিলেন। নিশীথচারিনী বাধা দিতে গিয়ে পারলেন না বা দিলেন না, বোঝা গেল না।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় যে সত্য প্রকাশ পেল তা ঢাকবার। গোপন করবার। কিন্তু জীবনের এরকমই রীতি যে ঢাকা যায় না, গোপন থাকে না।

বিক্রম শা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে রুদ্ধস্বরে বললেন, "আপনি ? আপনি জীবিত ? আপনিই মৌনী তরুণী ?"

নিশীথচারিনী ওষ্ঠে তর্জনী রেখে ইশারা করলেন।

বিক্রম শা বললেন, "কিন্তু—"

নিশীথচারিনী বললেন, "কিন্তু কী ?"

বিক্রম শা বললেন, "শুভঙ্কর ঘোষকে লেখা আপনার চিঠিতে মহারানীর হস্তাক্ষর দেখেছিলাম। অর্থ বুঝিনি।"

নিশীথচারিনী অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, "অর্থ অত্যন্ত সরল। সেদিন অতিথিমহলে মৌনী তরুণীর জায়গায় মহারানীই ছিলেন।"

বিক্রম শা বললেন, "জাহানারা বেগমের নতুন স্বামী, সংসার—"

নিশীথচারিনী নীরব। শুধু তার দুচোখ বেদনাব শিশিরে আর্দ্র হয়ে আসে।

বিক্রম শা বললেন, "বুঝেছি।" বড় হিসেবের কথাটা মনে হয়। অদৃষ্ট হয়তো এ ভাবেই সুযোগ দিতে চায়। বিক্রম শা একটা প্রচণ্ড অনুভূতি সহস্র চেষ্টায়ও চাপা দিতে পারলেন না। নিশীথচারিনীর একটা হাত নরম মুঠিতে ধরে বললেন, "আমার উপর নির্ভর করুন।"

নিশীথচারিনী দৃঢ়স্বরে বললেন, "আমার নির্ভর অদৃষ্ট ও আমার আকাঙ্ক্ষা। কারো উপর নির্ভর করাব মতো নরম মন আমার নেই। একথা মেনে নিয়ে মন স্থির করুন।"

বিক্রম শার চোখে যোদ্ধার বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠল। বললেন, "করলাম।"

সন্ধ্যাবেলা আমেদ চৌধুরী কাস্‌ল্‌-য়ে এলেন। চিরপরিচিত আমেদ। ফিটফাট কেতা দুরস্ত সায়েব। তার পকেটে মহাবানীর অনুমতি-পত্র। দেখানোর প্রয়োজন হল না। বিক্রম শা জানতেন।

বিক্রম শা বললেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে চৌধুরী কাস্‌ল্‌-য়ে টহল দিতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না।"

আমেদের ইচ্ছাক্রমে বিক্রম শা তাকে তিন-ঘরের একটা ছোট নিভৃত মহলে নিয়ে এলেন। বললেন, "মুস্তাফাকে মহারাজা এই মহল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা মহারানী তাঁর সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করতেন।"

আমেদ বললেন, "বাধা না থাকলে আমি এখানেই বিশ্রাম করব।"

বিক্রম শা বললেন, "স্বচ্ছন্দে। মহারানীর অনুমতিপত্রে কোনো মহলই বাদ দেওয়া হয় নি।"

আমেদ মৃদুস্বরে বললেন, "মুস্তাফা ও আমি অভিন্ন আত্মা। আজ এখানে কিছুক্ষণ তাঁকে স্মরণ করব।"

সারাদিন সারা সন্ধ্যা, প্রায় সারা রাত মহারানী অধীর প্রতীক্ষায় কাটালেন। আমেদের কথামতো আজ শুভঙ্করের আত্ম-সমর্পণের দিন। সে মহারানীর পা ছুঁয়ে সাধনার শপথ নেবে।

ভোর রাতে মহারানীর ঘরে টেলিফোন বাজল। মহারানী ধড়মড় করে উঠলেন। রিসিভার তুললেন।

মুস্তাফার গলা। তা হলে মুস্তাফাও উপস্থিত! বেচারা মুস্তাফা। আজ তাকে কী ভাবেই না হার মানতে হচ্ছে!

মুস্তাফা বললেন, "আমেদের কথার উপর আমার কথা নয়। শুভঙ্কর আধ ঘণ্টার ভিতর তোমাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে। তুমি প্রস্তুত হও।"

মহারানীর বুক জয়োল্লাসে ফেটে যাবার মতো হল। প্রস্তুত? প্রস্তুত' তো হবেনই। ঈশ্বর সাধনায় আজ তাঁর রাজযোগ। আকৈশোর উদাসিনীর বেশে সাধনা করে এসেছেন। আজ রানীর মতো সাজবেন। রাতের আকাশ যেমন জ্যোতিষ্কে ঝলমল করে ওঠে, তিনি অন্ধকারের তপস্বিনী আজ বসনে ভূষণে সেজে রানী-মহলের অন্ধকার আলো করবেন। মহারানী বহুদিন পর অলঙ্কারের পেটি খুলে হীরে, মুক্তো, মণি, জহরত ও প্রবালের কণ্ঠহার, মণিবন্ধ ইত্যাদি বার করে নিলেন। ভোরের আকাশে তারার পটের মতো একটি বেনারসী পরলেন। বাহুতে কেয়ূর পরতে গিয়ে হাসলেন। আজ তিনি সাধনার উৎসবের জন্য সাজছেন।

কথামতো মহারানী রানীমহলের দরবারে গিয়ে বসলেন। আজ আর জাফরীর আড়ালে নয়। সম্মুখে। আজ তাঁকে তাঁর জয়ের মুহূর্তে যে চায় দুচোখ ভরে দেখুক।

মহারানী সিংহাসনে বসেন। দরবারের সম্মুখে মাঝখানের দুটো থামের ভিতর দিয়ে অন্দরের একটানা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার শেষে একতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি উঠে এসেছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে শুভঙ্কর দোতলায় উঠল। মহারানী দেখলেন। সে ধীরে ধীরে তাঁর দিকে আসছে। এখনও সঙ্কোচ! এখনও দ্বিধা! মহারানী দেখলেন সেও সেজেছে। উৎসবের সাজ। ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর। কে তাকে এই বুদ্ধি দিল? কে সাজালো? মহারানী বিস্মিত পুলকিত হন।

শুভঙ্কর এসে মহারানীর পায়ে হাত দিয়ে বলল, "মহারানী! আশীর্বাদ করুন। আমি যেন সুখী হতে পারি। সুখী করতে পারি।"

কিন্তু শুভঙ্করের কথা মহারানীর কানে যাচ্ছে না। তাকে তিনি

দেখছেন না। তাঁর দৃষ্টি অদূরে অলকার উপর। অলকার বধূবেশ। শুভঙ্কর পাশে সরে গেল। অলকা ধীরে ধীরে এসে নত হয়ে প্রণাম করল।

মহারানীর হৃৎপিণ্ড প্রায় স্তব্ধ হল। প্রণামে তাঁর পায়ের রক্ত জমে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো তিনি ঈষৎ হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু আরো কারা আসছে? বিক্রম শা? বিদিশা? বিদিশা প্রথম প্রণাম করল। মহারানীর হাত উঠছে না। আশীর্বাদ করবেন কী করে? কিন্তু তিনি মহারানী তমিস্রা চৌধুরী। এই কাতরতা তাঁর শোভা পায় না। আশীর্বাদের জন্য মহারানী হাত তুললেন।

বিক্রম শা প্রণাম করে বললেন, আপনাকে লিখেছিলাম একটা বড় হিসেবে ঠকে না যাই। চৌধুরী কাসল্‌-এর জন্য কিছু করতে চাই। এ ভাবেই করবার সুযোগ নিলাম। সব জেনেই আমি বিদিশাকে গ্রহণ করেছি মহারানী।"

বিদিশা বিক্রম শাকে বলল, "গ্রহণ করেছ না অদৃষ্টের অনুগ্রহে লাভ করেছ?" মহারানীকে প্রণাম করতে করতে বলল, "মহারানী মার্জনা করো। আমি ও তোমার ম্যানেজার জীবনের দুটি অশুভ গ্রহ। হয়তো পরস্পরকে আঘাত করব। কিন্তু আমরা তোমাকে আঘাত করতে চাইনি।"

মহারানী মুখের ভাষা ফিরে পেলেন। বললেন, "আঘাত? আমাকে আঘাত করবে কে? কিন্তু তোমরা আমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছ। চৌধুরী কাসল্‌-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এখানে তোমাদের স্থান নেই! তোমরা যাও। পার যদি সুখী হও।"

বেদনাক্লিষ্ট মনে দুই নব দম্পতি মহারানীর অনুচ্চারিত অভিশাপ মাথায় নিয়ে বিদায় হল।

জাফরীর অন্তরাল থেকে আমেদ বার হয়ে এল। রোষে বিস্ময়ে, কৌতূহলে মহারানী তাকে দেখলেন। বললেন, "তুমি কে?"

"আমি ?" আমেদ হাসল। অনুকম্পার আর্দ্র হাসি।

কণ্ঠস্বরে মহারানী চমকে উঠলেন। বললেন, "মুস্তাফা! তুমিই আমেদ ?"

মুস্তাফা হেসে বললেন, "বিশেষ অবতারের লক্ষণ। একাধারে দুই রূপ।"

মহারানী তিক্তকণ্ঠে বললেন, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে মুস্তাফা। চৌধুরী কাস্‌ল্‌-য়ে তোমার নতুন কাজ ফুরিয়েছে। তুমিও যাও।"

মুস্তাফা বললেন, "আমার সেরকম কোনো অভিপ্রায় নেই মহারানী। আমি যাবো বলে আসিনি।"

মহাবানী বললেন, "যদি বলি আমার আদেশ ?"

মুস্তাফা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "মানতে বাধ্য নই তমিস্রা। মহারাজার উইলের জোরে তুমি মহারানী। উইলেব প্রধান সর্ত, তাঁব সব কটি নির্দেশ যতদিন মেনে চলবে, ততদিনই তুমি মহারানীর আসনে থাকবে। মহাবাজা একটা মারাত্মক নিদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। পড়ে দেখো। এই নির্দেশেব ফলে চৌধুবী কাস্‌ল্‌-য়ে আমার অবারিত দ্বার। মুস্তাফা মহলে আমি যতদিন খুশি থাকবো। আমাকে কোনোপ্রকাবে বাধা দিলে উইলের নির্দেশ অমান্য করা হবে।"

মহাবানী বললেন, "তোমার অভিসন্ধি কী ?"

মুস্তাফা বললেন, "ঈশ্ববসাধনা বন্ধ রেখে আপাততঃ কিছু কাল তোমার সাধনা কবা।"

মহারানী তাচ্ছিল্য করে বললেন, "তোমার ব্যঙ্গ আমাকে স্পর্শ করে না।"

মুস্তাফা বললেন, "ব্যঙ্গ নয়। একটা নতুন আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘ পনেরো বছর আড়াল থেকে অতিথি মহলের কলকাঠি নাড়ছি। আজ তোমাকে স্বচক্ষে দেখছি।"